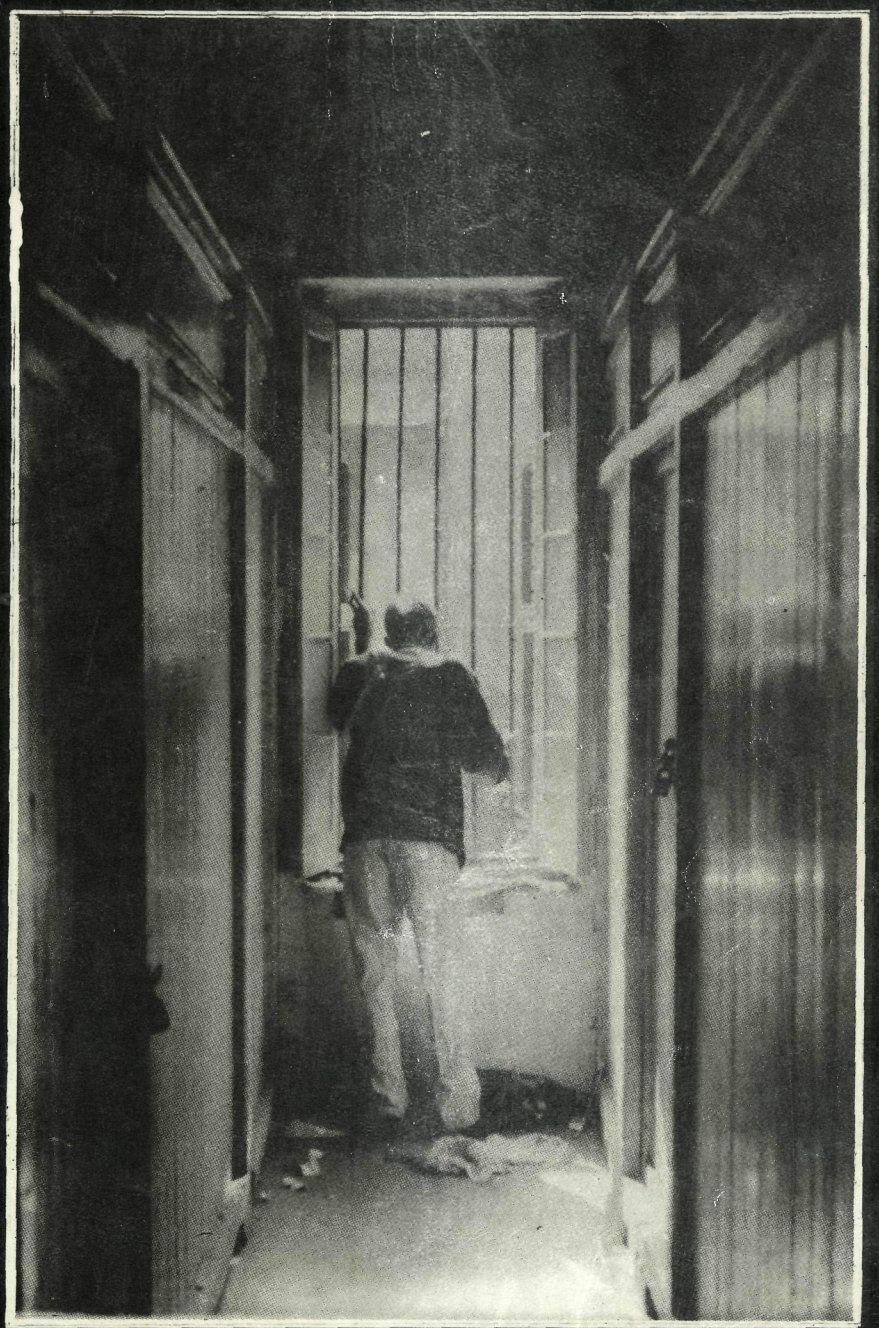

Presidency College Magazine 1996-98

Presidency College Magazine

Combined Volume: 1996-98

Professor-in-charge

H. N. Chatterjee

Editors

Bodhisattva Kar
Anirban Mukherjee
Anindyo Sengupta
Kumar Kislay

Publication Secretaries

Raja Bhattacharya
Ashis Pathak

Cover Photograph

Jit Roy

Printer

SHILALIPI
16A Tamer Lane
Calcutta 700 009
Phone: 241 4580

ক্ষয় শুধু আত্মগত নয়, পরিপার্শ্বে তুমুল অসুখ। বোকাবাক্স, আর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে তার পঞ্চাশ কিসিমের নখ, সুন্দরীর রূপচর্চা, আর এছাড়াও সংসারের খুঁটিনাটি, ডিমের কচুরী ভাজার সহজ সাতটি পথ, ওদিকে সাফল্যলাভ, কী ক'রে বন্ধুদের ছুরি মারবে রক্তপাতহীন, এবং করেখাচর্চাও, ক্রমাগত তাবিজে বিশ্বাস করুন, আর বাঁজা শ্লোগান থেকে উথলে উঠুক শোক, মৃত্যুগুলি হয়ে পড়ছে প্রসঙ্গবিহীন...

অথচ বৃষ্টির কথা ভাবি, ঘুরে-দাঁড়ানোর কথাও। এই সমাধি-শহরে, এমনকি, নতুন লেখাও শুরু করি। আর তাদের ভাসিয়ে দিতে থাকি হাওয়ায়-আলোয়...

'আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের'

সম্পাদকমণ্ডলী

'Presidency is dead', they say. Presidency replies that they are dead. One intervenes with a question picked up from Rushdie : Can only the dead speak ?

It should by now be clear that nothing is to be gained by opposing one reified theme— Tradition— by another— Decadence— in a polemic debate as to ultimate priority of one over the other.

A spectre is haunting Presidency : the spectre of creativity.

Writing is the nightmare from which all of us are trying to wake up, but which in doing so we merely dream again. What else do we need to say about the purpose of our publications, about their unblushing irregularity, and even about ourselves ?

The Editorial Team

কলেজের শেষতম পত্রিকাটি প্রকাশের পর দু'বছর পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে রাজাবদল ঘটেছে দেশে। রাজা কিংবা মন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে ছিলেন যাঁরা তাঁদের জামাকাপড়ের রংও বদলে গেছে অনেকবার। পথ-বিপথ ঠিক করেছেন ওঁরাই, ভবিষ্যতেও করবেন। তবু আজ অন্য মাত্রায় উঠে আসছে আরণ্যক বালিকার প্রশ্নটি, "ভারতবর্ষ কোন্ দিকে ?"

উত্তর বমন করে অন্ধকার। সারি সারি লাশ চলে যুদ্ধে। আলোর খোঁজে। একক জীবনের উজ্জ্বলতার খোঁজে। সে আলোর পর গভীর গভীরতর হয়ে নামে অন্ধকার।

তিন বছরের কলেজ-জীবনের একমুখী দৌড়ে এসব তবু ডুবে যায় অসহায় অর্থহীনতায়। বরং ক্ষত-মুখগুলিকে ঢেকে নেওয়া যাক শিশুপাঠ্য রচনায়। আর কিছু 'কিছুই-না' ছুঁড়ে দেওয়া যাক, খ্যাত হোক নাম।

হতাশ করেছে এই প্রবণতা। তবু অন্য 'কিছু'র খোঁজে শ্রমিক হয়েছি, শরিক হওয়ার লোভে। রেখা আর রঙে, শব্দ কিংবা নৈঃশব্দ্যে ধরে রাখতে চাইলাম খুঁচিয়ে পাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া অথবা পড়ে পাওয়া সেই সবকে।

এখন বিচার চলুক। সমালোচনা আসুক।

প্রকাশসচিব

আশিস্ পাঠক

রাজা ভট্টাচার্য

Presidency College Magazine

Combined Volume: 1996-98

Contents

কবিতা

একটি পারিবারিক কবিতা/ঋতদীপ ঘোষ, ৭। একটি নাগরিক বৃত্তান্ত/অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, ৭। কোনো এক কুয়াশাকে লেখা খোলা চিঠি/রাজর্ষি রাউত, ৭। মাছ/সুসিত মিত্র, ৮। সমীপেষু/রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়, ৮। দিনযাপন/সুমন চক্রবর্তী,৮।

ব্যক্তিগত গদ্য

হ্যালুসিনেশন/অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ৯। মাধুকরী/ফাল্গুনী ঘোষ, ১১।

Personal Essay

'Coz He's A Man/Shilpi Sarkar, 13.

গদ্য

শূন্যের ভিতরে ঢেউ/জয়দীপ ঘোষ, ১৪।

Jest

It's Still Raining Cats and Dogs/Sunando Sarkar, 20.

Essay

Notes Towards A New Theory of Culture/Tirtha Prasad Mukhopadhyay, 22. Reality and Consciousness: A Sceptical Viewpoint/Santanu Chakrabarty, 27. From the Imagined to the Illusory: Notes on the Post-Indian Nationalisms/ Bodhisattva Kar, 30. Defending the Indefensible /Kingshuk Chatterjee, 34. On Liberalism/Boria Majumdar, 40. God— and why I Believe in Him: A Western Perspective/Projit Bihari Mukharji, 49. The Burgess Shale Fauna/Rhitoban Roy Chaudhury, 52.

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ সংস্কৃতি অথবা তোমারই রাজ্যে হে নৈরাজ্য/শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৮।

Report

A Visit to Mattur/Dr. Prashanta Kumar Dasgupta, 64.

স্মৃতিচর্চা

স্মৃতি প্রায়শই কৌতুকের, দুঃখের, সুখেরও/ধ্রুব গুপ্ত, ৬৮। কিছু স্মৃতি, স্বীকারোক্তি/তপোব্রত ঘোষ, ৭৪।

স্মরণ

তোমার চোখের আকাশ উড্ডীন গোধূলিতে/জয়শ্রী দে, ৮১।

গল্প

বিষণ্ণ অধ্যাপকটির যেসব কথা বলার ছিল/রাজেশ ভট্টাচার্য, ৮৬।

কবিতা

মুক্তি-কাব্য/বাগেশ্রী মিত্রা, 90। क्योंकि समय एक शब्द है.../सोम सारस्वत, 90। अनुभूतियाँ भी तो रोष हैं/सतोश कुमार सिंह 90।

কহানী

विकल्प/सुनील कुमार द्विवेदी, 91.

The Editorial Collective

A Genealogical Elaboration, 95.

একটি পারিবারিক কবিতা

ঋতদীপ ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

যাপনের শব্দ হাতে ধানক্ষেত
ডিঙোনো ট্রেন— মাঝরাত— ঘ'টে
যাওয়া যাবতীয় মাঝরাতগুলি
—একবার ব'লে যাও, ব'লে যাও
পারিবারিকতা— তোমাদের সাথে
নাকি দূরতর পরিচিতি আছে

একটি নাগরিক বৃত্তান্ত

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ
অর্থনীতি সাম্মানিক

এইসব পর্দাহীন শহর আর নক্ষত্র মুখ;
লজ্জাবতীর সেই অচেনা নির্মাণ
স্পর্ধিত চুম্বন রেখে যায় আমাদের নামে।
আবাল্য স্বপ্নের সেইসব বিকেল বেরিয়ে পড়ে,
একটা লম্বা তেপান্তর দিয়ে সমস্ত ঘুম
মুছে দেবে বলে...
আমাদের অবিশ্রান্ত যাপন থেকে যুদ্ধ ওঠে।
ফলত রক্ত রাখা থাকে নিম সন্ধ্যার নীচে।
শুধু কিছু বৃত্ত আঁকা হয়, কিছু আয়তক্ষেত্র।
ওখানে সযত্ন থাকে ভিজে যাওয়া, শিশিরের মতো।
তবু গান কেন?
—নির্দিষ্ট সজ্জায় কিছু নিরুত্তর চোখ,
পাখিঘর, হাওয়া-মোরগের সুনির্দিষ্ট চলাচল,
—অস্পষ্ট উচ্চারণমালা, শুধু কান পেতে রাখা।
ঘাসের নীচের স্তরে তবু অন্য কথা বলা হয়ে চলে
যদিও সে অন্য যাতায়াত, অন্যতর বলাবলি।

কোন এক কুয়াশাকে লেখা খোলা চিঠি

রাজর্ষি রাউত
দ্বিতীয় বর্ষ
পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক

কলাপাতার ওপর জমে-থাকা কুয়াশা
আমায় বলেছে
'ভুলে যাও'
আর আমি বলেছি
'আমার যে সকাল হবার কথা ছিল।'

রক্তমাংসের খাঁচায় যে কাকটা
আঠারো বছর ধরে কাঁদল
সে আজ একুশে ফেব্রুয়ারী করে
আর আমি তাকে সোনার শিকল পরিয়ে দিয়ে বলেছি
'উড়ে যাও।"

চড়ুই, শালিকগুলো মিথ্যে এত সংশয় দিয়ে গেল
শিবপুরের বটগাছটা মিথ্যেই ভিজল, পুড়ল
একশ পঁচিশটা বছর ধরে।
মেঘদূত না জন্মালেও চলত
তাজমহলেরও প্রয়োজন ছিল না
আর যে রাতগুলো ধরে ধ্রুবতারার আলোয়
আমি কুয়াশাকে খুঁজে বেড়িয়েছি
সেই আট ঘণ্টার অন্ধকার জুড়ে
আমি মেহের আলিও হতে পারতাম।

সকাল হওয়া হলো না
আকাশকে দেওয়া হলো না উপহার
শুধু আগামী শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের জন্য
কিছু ফসিলের মধ্যে পেয়ে যাবে
শুকনো কান্নার নুন
অথবা না হওয়া সকালের দীর্ঘশ্বাস।

অথবা সেই ধ্রুব সত্য—
সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসানে
আমি তো রইলামই
কুয়াশার আড়ালে
কলাপাতার ওপর
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত হয়ে।

মাছ

সুসিত মিত্র
প্রাক্তন ছাত্র
বাংলা সাম্মানিক

গতকাল সন্ধ্যের শার্টটি
ভিজে যাওয়ায় তুমি যে শুক্‌নো
আরেক দ্বিতীয় ঘুমভাঙা
শরীরের আলমারি থেকে
আমার শরীরে দিলে ছবি
আজ সন্ধ্যের বৃষ্টিতে সেটিও
ধুয়ে গ্যালো রঙ— এইভাবেই
সন্ধ্যে ও বৃষ্টিগুলি ক্রমে
যত জীর্ণ হয়ে আসে দিন,
বড়ো-সড়ো পকেটওয়ালা
নিত্যনতুন শার্টের ব্যবহার--
-প্রণালী ব্যাপী উদ্বিগ্ন
বোতাম-হারানো আমাদের
বেড়ে ওঠা, মহানুভবতা।

সমীপেষু

রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ
বাংলা স্নাতকোত্তর

সমর্থন জনিত কোনো বিষাদ ছুঁয়ে
আছে কাণ্ড পাতা সীমানার মুখ
আর বারংবার জল দেখে নিচ্ছে
তার অভিমুখ; বন্যার খবর পেয়ে গেছে
চুপচাপ তাই এত গোপন
চিৎকারে আকাশ সমতলীয় ছবি ফোটাচ্ছে।
বর্তমান ক্রিয়াগুলোকে সঠিক স্থানাঙ্কে
ছাড়লাম নতুবা গ্রাগুলো বেশী রেখা তৈরী করতো...
আজও কে তুলসীতলায় আলো জ্বালাবে
শরীর করবে দৃশ্যতর যেরকম অভ্যাসগুলোর
কোনো সম্বোধন থাকে না বা নিতান্তই
সমীপেষুর মতো বাস্তব ঘটনা অন্তত
কবির মতো লোকও যদি তা স্বীকার করে...

দিনযাপন

সুমন চক্রবর্তী
প্রাক্তন ছাত্র
বাংলা সাম্মানিক

টেবিলে মরা মোমবাতির থেকে জেলির মতো মোম
দু আঙুলের ফাঁকে চটকানো আর চর্বিত চর্বণ
গল্পের শুরু এভাবেই; কিছুটা দূর এগোলেই
অট্টহাস্য নিয়ে আসে নদীর বাঁক, সামনেই গাছ
প্রত্যেকটা গাছের নাম ওক-পাইন-ফার, বড়-জোর দেবদারু
পাতার ফাঁক দিয়ে ছায়া ভগ্নকারী হলদে সূর্য
কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে নেয় ছড়ানো বাদামের খোসায়
নানান ছবি— জায়গার নাম বনপুকুর
টিলার উপর দোতলা কাঠের বারান্দা বরাবর
নেমে আসে সবুজ ব্রততী, এসব থাক
এখন তো বর্ষা, সব ছবি ধুয়ে-মুছে...
সব টিলা...
এভাবেই চেয়ে থেকো মৃদু এ মোমের গন্ধে।

হ্যালুসিনেশন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
বাংলা স্নাতকোত্তর (প্রথম বর্ষ)

১. লেটার টু এ লার্নেড নেবার

এইখানে দ্যাখা হয়েছিল প্রমোদদা, তোমার অনার্স-কোর্স, উভমুখী জ্বালাতন, অভিমান, ঠুনকো কাঁচের মতো ভালোলাগাগুলো নিয়ে আমাদেরও সদ্য ডিঙিয়ে আসা পিউবার্টি সব বৃদ্ধের মননশীলতা পেয়ে গেল, অবশ্যই অপাপবিদ্ধ কারণ খোঁজার বশে ব'লে ফেলি তাহ'লে পার্ফেক্ট টেন ব্যো অ্যাণ্ড অ্যারো শুধু অপেক্ষমান জেদী মুখ খুঁজে হয়রান এবং অলিম্পিক, সমস্ত মেডেল জানে এক কথা, সকলেই সব জানে, জানে পূনর্মূল্যায়ন, আতিথেয়তা (নবাগত হলে তার পরিমাণে স্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধি হয়তো বা অপচয় নয়), আর পারম্পর্য, প্রেসিডেন্সীয়ানা, নেগলিজেন্স, ফের ভালোবাসা (ভালো-বাসা!) ব'লে রিমেক এলিট সব কূটকাচালি, প্রতিবেদকের নাম অবশ্যই উহ্য থাকে না।

বালক বৃদ্ধ আর তার পিউরিটান চোখমুখ তবু অন্য কথা বলে। কার কথা? উত্তর কোনো প্রশ্ন হতে পারে না যেমনটা তার রিভার্স, রিটার্ন, অথবা যদি শুধু টার্ন বলো তাহলেও উইংস্-এর পাশাপাশি সরে যাওয়া, পর্দার বিভেদকামী অবসাদে পৃথিবীর দশদিক তবুও এমন, এমনই সব বোধগম্য নীরব ভায়োলিন, ভাঁজ করা ডানা আহা, যদি আমাদের পুচ্ছ-সংযুক্ত

হ'ত উড়লেও আপদ যেত না, সুকুমার...
শুধু কুমোরের কথা বুঝি, মাটির পাত্র বুঝি, সে অর্থে মাটিও বুঝিনা, ওহ্ জেনারেলাইজেশন, মাটি মেখে শুয়ে থাকা বিছানা বালিশ যদি মাটি হতো, এমন কী আর মাটি হতো আমাদের স্বীকার, শিকার...

২. দর্পণ সংক্রান্ত ফোবিয়া

'আমরা কলেজস্ট্রীটে কী সব খুঁজতে এসেছিলাম'[১] সেই ক্যালিডোস্কোপিক ভাঙাচোরা থেকে দু'চার কলম খিস্তি খেউড়, এক কলম প্রেম আর চুলচেরা হিসেব নিকেশ ছেড়ে কবিতার প্রলেপ দিয়ে লিপি সাজালাম; প্রাক্তন আগুন, কলেজ স্টুডেন্ট, তিনি কাকে নিয়ে ঘর করবেন! তিনি রাবণ হলে বীরবাহুকে ডানহাত দিয়ে সমস্ত বানান— ভুল সমেত কব্জা করতেন, যদিও তিনি তাঁর বাঁ দিকটি ব্যবহার করেন কান হিসেবে।

মেঘনাদ, তুমি আমার কান দিয়ে শোনো

৩. 'অন্তত জন্মের জন্য শোক করো।'[২]

আত্মা, আমরা কতদূর যাবো? যেদিকে ঘুম আছে! আমরা ফিরি, বৃষ্টি হয় না, গোলাপী লজেন্সটুকু শুধু পড়ে থাকে। সেই দিকে যাওয়া।

৪. নিছক প্রক্রিয়াগুলি আছে

এমন হাজার লাইন পড়ে আছে, ট্রেণ চলে দিনে দু'বার। সকালের ট্রেণ থেকে গার্ডসাহেবকে সে সময় আমি প্রসন্ন দেখেছিলাম, তাঁর চোখ দুটি স্থির ছিল। সুতরাং বিকেলে খারাপ লাগলে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বোসো, তোমাকে কাঁদাবো।

৫. EVERY BODY KNOWS

That's how it goes, এইভাবে দিন কাটে কোনো শান্ত টিলার উপরে, পাশে ফার্ণেসের শেষ কাঠটুকু হারিয়ে ফেলেছো তুমি, ধরা যাক তোমার ইমেজারি আমার কাছে গোল হয়ে আসে, পাক খেয়ে ফিরে যায়, "হয়ত প্রাপক সেও মরে হেজে গেছে কোন কালে"[৩] হয়তো কবিতা আছে সেখানেও।

৬. আই সি মাই লাইফ শাইনিং

যে কোনো দিন, যে-কোনো সময়ে মুক্ত হতে পারি, ওহ্ সেই জেনারালাইজেশন, কিপ হোপ ফর ফিউচার, নাথিং এলস্, এই চিঠি, এইখানে দ্যাখা হয়েছিল।

---

১. 'প্রবীর দাশগুপ্তের কবিতা'; 'প্রবীর', ভূমিকা অংশ, অচ্যুত মণ্ডল
২. 'হাওয়া বাড়ী', তন্ময় মৃধা, পৃঃ ৩৭
৩. 'কবিতা সংগ্রহ', উৎপল কুমার বসু; অগ্রন্থিত কবিতা, পৃঃ ২২১

মাধুকরী

ফাল্গুনী ঘোষ
প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

কয়েকটা সিগারেট ক্রমশ ওয়েলডিং মেশিন হয়ে যাচ্ছিল। সুদূর ঘাসগুলো ক্রমশ রেললাইন হয়ে ঝুলে পড়ছিল সিলিঙে। সিলিঙে কোথাও ফ্যান নেই বলে মনে হয়। কিন্তু হাওয়া বিলক্ষণ আছে। নাক মুখ দিয়ে অন্তরীণ ক্ষতচিহ্নরা এরকমই বেরিয়ে আসে। জিগ্যেস করি কোথায় শুরু ক'রে টেবিলগুলো এখানে অবশেষ পায়। ভাল মেয়েরা আঁকাবাঁকা জীবনময়তা কোন গানেই পায়নি। অতএব এই হাওড়া প্ল্যাটফর্মে ক'টুকরো ছেঁড়া মেঘ রেখে উধাও হয়ে যেতে ভালবাসে। ভালবাসে, ফর্সা হয়, ফর্সা হয় আর অপরূপ তন্ময়তার প্রভাতী দুধের ক্যানে। বিষ্ণু দে তাঁর কবিতার মাথায় একটুকরো সংস্কৃত বসালেন। তোমরা আমাদের শেখাতেই পার স্বরবৃত্ত কি প্রকার জীব। এরা তো বিষয় নয়। তবে কিভাবে সেই নির্জলা ক্যারাভানের পাশে ব'সে জলের মধ্যে তাহাদের কথা লিখে ফেল! আমাদের বস্তি নিষিদ্ধ শামিয়ানার নীচে চোখ নাক আর জননের শুভ্রতাটুকু ঝুলিয়ে দিচ্ছে স্টেশনপার্শ্বের রাজপথে। এতেই আমাদের জন্মপরিচয় সৎ— জেনে ফেললাম। যদি এখানেই সেই লোকজন মিষ্টান্নভাণ্ডার থেকে শহরের রাস্তায় রাস্তায় আর শহুরে বাড়িতে টেলিফোনে রাস্তারা মাতৃপ্রতিম হয়, তবে শব্দাঙ্কটুকু টেবিলের মাঝখানে শাদা হাতখানি জুড়ে রেখে দাও।

ওখানে মাত্রাহীন যতিচিহ্ন লুপ্তপ্রায় ক্যাসেটের সাথে উড়তে থাকবে। আর তুই নিশ্চয়ই পুরুষবন্ধুদের বাড়িতে আনবিনা। তাতে এই অবকাশটুকু সমকামী হয়ে যাবে। সহজেই প্রতিমার দাম ধার্য হবে কাশবনের বর্জনপ্রিয়তায়। 'হে উঠোন, হে টব' ভেবে ভেবে কামারশালার ঐ ছুরির হাতলটি তৈরী হয়ে গেল। এতক্ষণ তোমরা যা শুনলে, এসবই শিখে নিয়েছিলাম দাদাদিদিদের কাছে। দাদারা দিদিদের সাথে অথবা দাদাদের অবিকৃত চশমাটি দিদিদের হেয়ারব্যাণ্ডের সাথে সারাদিন গুঞ্জন পছন্দ করে। এটা বোধ হয় প্রেমালাপ। না না এটা নয়। কারণ প্রেমালাপে ভালবাসার দ্বৈত প্রয়োগ আছে। অথচ কি করে চশমার ফটোক্রোম্যাটিক মিশে যাচ্ছে হেয়ারব্যাণ্ডের সুচারু পাখনায়। এমন সুচারু আমরা খুব ভালবাসি। ছোটবেলায় মা এমন সুচারু মিষ্টি দিয়েছিল। বলেছিল 'নামের পিছনে এক হরিণ সর্বদাই ছুটে চলে। আর গ্রাস করে তাবৎ বিশ্বের ঘাস।' 'মা, আমি একটাও ঘাস ছুঁয়ে দেখবনা কোনদিন।' অতএব কপালে বসে গেল উত্তর নামের শব্দরূপ। শব্দ আমাদের মাথায় কোত্থাও নেই। আর তুই তো মাঝে মাঝে এভাবেই শরৎ খুঁজিস। কিন্তু আরো বড় হলে এখানে একটি চতুর্বার্ষিক পত্রিকা বার করব, সেখানে হঠাৎ দেখা হওয়া জ্যাঠামশাই অন্তিম কবিতাটি পাঠিয়ে দেবেন। আর কাকাবাবু আপনি তো দাদারই পিতৃদেব, তাই না ? আপনিও পাঠিয়ে দেবেন শেষতম তামাকের কণা। সেটাও আমরা রেখে দেব অথবা ছেপে দেব প্রথম পাতায়। ছাপতে তোমরা সবাই রাখবে তোমাদের আঙুল। নোখের উপর দিয়ে ডি. টি. পি. লেটারিং পূর্বজন্মের কথা লিখবে। যেটুকু শূন্যস্থান অমিতাভদা, শিখিয়ে দাও, কিভাবে একটা আবহ মাথাকে জারিত ক'রে নিকোটিন বানায়! আমরা আদিগন্ত বৌদ্ধ শ্রমণ সেই বাদামী দরজায় ধীরে ধীরে বৈষয়িক হয়ে যাব।

'Coz He's A Man

Shilpi Sarkar

Third Year
Sociology Honours

Why can women and girls cry such a lot? Why is it O.K. for women to cry such a lot? Why can they cry so much in front of people? Why can they not just show their grief but display it in front of all and sundry? Why then should a man break his heart in private? 'Coz he's 'strong' and 'non-sentimental' and 'never hurt'? ...just at times I can understand how frusturated a man must feel... he feels lonely, miserable, horribly sad and he's cracking up inside with grief— not only can he not ever show sings feeling 'under the weather' in front of anybody— it would be a sign of 'tremendous strength' if he could hide his tears from himself as well— i.e. never, ever shed them in the first place to begin with... and not only does he have to bear all of the above and more but he can never, ever crib about his situation— NOW THAT IS UNHEARD OF.

Can you imagine what a funny creature a man would look like if he stated in not so many words that he be allowed to express his grief, his sorrow, his heartbreak? That he be allowed to be more human and less sub or super human? Can you imagine how much he would be laughed at... how much he would be ridiculed— here we are women of the world screaming about our strength— wanting to be strong. wanting to be ice-maidens. wanting to be solid and 'expressionless' with a non-hurting self and there lies a sissy who wants to be what he is... it's easier when you are fighting to be strong and inhuman and emotionless— you can't even fight if you want the opposite— so much harden to be a human being with emotions... so much harder to say that you are a human with emotions— so much harder to admit the same to yourself.

শূন্যের ভিতরে ঢেউ

জয়দীপ ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

এক

তুমি কি কবিতা বোঝ? আমিও কি বুঝি? সারাদিন তো তুমি কত কবিতা পড়ো। সব বুঝতে পারো? আর আমি, যে অনায়াসে কবিতার দুর্বোধ্যতার উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে কবিতা-বিমুখ হয়ে বসে আছি, আমিও কি সেই দায়ের অন্তত কিছু অংশ নিজের কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করেছি কখনও?

'তুমি কি কবিতা পড়ো? তুমি কি আমার কথা বোঝ? ঘরের ভিতরে তুমি? বাইরে একা বসে আছো রকে? কঠিন লেগেছে বড়ো? চেয়েছিলে আরো সোজাসুজি? আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।

[৬০ নং কবিতা/পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ]

এই তো, বেশ বোঝা গেল এই চার-লাইন। ঘরের ভিতর বা বাইরে রকে একা বসা যে দুজন, ওরা আমারই মতন কোন কবিতা-বিমুখ পাঠক। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য আমির মধ্যে থেকে যে-কোন দুজন। তাছাড়া, কবিতাটার শেষ লাইনে এসে বোঝাই যায় সেখানে রয়ে গেছে এক নৈকট্যবোধের স্পর্শ। 'আমি যে তোমাকে পড়ি...।' আমাকেও পড়েন কেউ?

এত সাধারণ যে আমি, আমারও কথা বোঝেন কেউ? হ্যাঁ, বোঝেন। আর বোঝেন বলেই তিনি কবি। কবি তাঁর শব্দ দিয়ে, কবিতা দিয়ে পড়ে চলেন আমাকে। একা আমাকে নয়; অসংখ্য আমাকে। তবে আমরাই বা পড়ব না কেন কবিতা?

তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রত্যেক কবিতার প্রতিটি শব্দের জন্য কি আমি খুঁজে পান নিজস্ব কোন মানে? যদি না পাই, তখন?

'কোনো যে মানে নেই, এটাই মানে।
বন্য শূকরী কি নিজেকে জানে?
বাঁচার চেয়ে বেশী বাঁচেনা প্রাণে।

শকুন, এসেছিস কী-সন্ধানে?
এই নে বুক মুখ হাত নে পা নে—
ভাবিস তবু পাবি আমার মানে?'

[মানে। মুখ বড়ো, সামাজিক নয়]

বেশ তো, নাই বা পাওয়া গেল সমস্ত শব্দের নিজস্ব কোনো মানে। কিন্তু এই আপাত অর্থহীনতার দায় কবির উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কোনো মানুষের হাত-পা-বুক-মুখ খুঁজলেই কি তাকে চেনা যায়? পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণত? যায় না। সেই মানুষটির বোধি আর চেতনার জগৎ ঐ রক্ত-মাংসময় শারীরিক জগৎ থেকে অনেক উপরে। তেমনি কবিতারও একটা বোধির জগৎ থাকে। থাকে চেতনা। কবিতা বোঝা আসলে সেই জগৎটাকে খুঁজে নিতে শেখা। কবিতার প্রত্যেক শব্দের পোস্টমর্টেম করলেই সেই জগৎকে চেনা যায় না। বস্তুত, প্রত্যেক শব্দের মানে না জানলেও চলে। আমাদের প্রতিদিনের দীনতা-তুচ্ছতার যে জীবনযাপন তার বাইরে বেরোতে হয়। কবি যেমন বললেন, বাঁচার চেয়ে বেশী বাঁচা, তেমনি আর কি। তারপর সেই বেঁচে থাকাকে খুঁজে নেওয়া যায় কবিতায়।

দুই

আমরা সকলেই বেঁচে আছি। এক সূর্যোদয় থেকে অন্য সূর্যোদয় অবধি প্রত্যেক মুহূর্ত জুড়ে আমাদের বেঁচে থাকা। কিন্তু সব মুহূর্তের বেঁচে থাকা সমান নয়। যেমন সমান নয় তোমার আর আমার বাঁচার মানে, বাঁচার প্রকৃতি। এই মুহূর্তে হয়ত আমি ভালোবাসায়, আনন্দে, আলোয় জড়ানো। পরের কোন মুহূর্তেই একাকী অন্তবিহীন সময়ের তলায় মনে হচ্ছে যেন দ্রাবিত হয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত। সেখান থেকে আর মুক্তি নেই। কবিরই মতো করে তখন মনে হয়—

'এক মুহূর্তের সঙ্গে অন্য মুহূর্তের কোনো আত্মীয়তা নেই
জলে স্থলে আত্মীয়তা নেই
কারণবিহীন এক মহাপরিণাম ভেসে যায়, ভেসে চলে যায়—'

[মুহূর্তের মুখ/ নিহিতপাতাল ছায়া]

এ কবিতা শঙ্খ ঘোষের। যেমন আগের উদ্ধৃত দুটি কবিতাও। কেবল এই একজন কবির কবিতাকে অবলম্বন করেই দেখানো যায়, কবিতার মধ্যে কত বিচিত্র ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় বেঁচে থাকার মানে। কত বিচিত্র ভাবে বাঁচি আমরা। যন্ত্রণা-আনন্দে, শূন্যতায়-ভালোবাসায়। কিংবা সবসময় হয়ত খুঁজে পাওয়া যায় না জীবনের কোনো সঠিক মানে। 'কোনো যে মানে নেই, এটাই মানে'— জীবনের ক্ষেত্রেও এ উচ্চারণ সত্যি হয়ে ওঠে।

'আমারই চেতনা তার উচ্চকিত প্রচণ্ড বন্যায়
ভেঙে যায়, রাত্রি বলে চুপি চুপি, ঝরুক ঝরুক
তোমার হৃদয় ঝরে পড়ে যাক মৃত্যুর অসহ
নগ্ন বুকে। রাত্রির লালিত দেহ ভরে দি কান্নায়।

পৃথিবী তোমাকে আমি দেখিনি, দেখিনা কতদিন

[অবগুণ্ঠিতা/ দিনগুলি রাতগুলি]

এ কবিতা যেমন এক মানে-হারিয়ে-ফেলা জীবনের কবিতা। 'আমারই চেতনা....ভেঙে যায়'— এমন এক বাক্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রথম দুটো লাইনের মধ্যে। ঐ যে বলা হল শারীরিক জগতের বাইরে কোন এক চেতনায় জগৎই আমাদের বাঁচার অনুপ্রাণ— সেই চেতনা যখন ভেঙে যায় তখন 'হৃদয় ঝরে পড়ে' 'মৃত্যুর অসহ নগ্ন বুকে'। তারপর গুমরে ওঠে কান্না। তারপর খানিকটা স্পেস, নৈঃশব্দ্য, চারিদিকে চোখ তুলে তাকানোর চেষ্টা। না, দেখা যায় না কিছুই; রাত্রি ঘিরে রয়েছে চারিদিকে। আর এত অন্ধকার

বলেই 'পৃথিবী তোমাকে আমি দেখিনি, দেখিনা কতদিন।' পৃথিবী আর জীবন এখানে সমার্থক। এ লাইনটাতে কবির সমস্ত আর্তি, সমস্ত ভালোবাসা দাঁড়িয়ে ওঠে। ভালোবাসা? হ্যাঁ, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এ পঙক্তি কেবল একটা statement নয়। পৃথিবীকে আমি দেখিনি বহুদিন— এই ঘটনাটুকু বলতে চাওয়া হচ্ছে না কেবল; বরং তাকে ছোঁয়ার বিপুল আর্তি জড়িয়ে আছে ঐ ছটি শব্দে। কেননা, রাত্রি তাঁকে ঘিরে থাকলেও কবি ভালোবাসেন পৃথিবীকে, জীবনকেও।

প্রায় একই উচ্চারণ অপর এক কবিতায়—

'শব্দ হয়ে যায় শব্দহীন
যেমন সমস্ত রং একাকার শাদায় গম্ভীর
ভিতরে আগুন নিয়ে তবু শূন্যে চেয়ে থাকে খরা
নিঃশব্দ ঝরানো নয়, নিঃশব্দ বুকের মধ্যে ধরা'

[নিঃশব্দ/ তুমি তো তেমন গৌরী নও]

এ কবিতা অন্য মাত্রা পেয়ে যায় এর উপমার ঝলকে ওঠা ব্যবহারে। শাদা রঙ রঙহীনতা নয় আসলে, বরং সমস্ত রঙের মিশ্রণে ফুটে ওঠা গাম্ভীর্য— এই বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু জানিয়ে দেন কবি। তারপর তার সাথে মিলিয়ে দেন শব্দহীনতাকে। আমার এই বিপুল নৈঃশব্দ্যের মানে এই নয় যে আমার কোন শব্দই নেই। আসলে কত শব্দের পাহাড় জমে আছে আমার বুকে, তা বাইরে থেকে কেউ বুঝবে না। যাদের বলার কথা অনেক কম তারাই বেশী শাব্দিক। নিঃশব্দ আমার 'বুকের মধ্যে ধরা' কারণ আমার বলার কথা পড়ে রয়েছে অনেক। ধূ ধূ তপ্ত প্রান্তরের হাহাকারময় শূন্যতার ভিতর যেমন লুকিয়ে থাকে আগুন। অন্য এক কবিতায় কবি যেমন বলেছিলেন 'শব্দের প্রকৃত বোধ কুয়াশায় একা পড়ে থাকে...'। প্রায় একই উচ্চারণ সব।

কথায় কথায় আবার এসে পড়ল বোধের কথা। তাহলে শব্দকে যেভাবে দেখি আমরা, সেটাই সব নয়। শব্দের প্রকৃত বোধ অন্য কিছু। যা অনেকসময় একা পড়ে যায় কুয়াশার আড়ালে।

আর একটি কবিতায় এসেছে এরকমই এক হাহাকারের শব্দ, একটু অন্য রূপে, যার নাম যন্ত্রণা।

'এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ, তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে।'

[বর্ম/ মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়]

যন্ত্রণার এত রৌরব উচ্চারণ আমি কমই পড়েছি। ঝলকে ভেসে ওঠে বালক অভিমন্যুর ছবি। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, একা। নিজেদের দিকে চোখ ফেরাতেই হয়। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে? একাকী যন্ত্রণার কোনো সংরক্ত মুহূর্তে তাই নিরুচ্চার চিৎকার ছড়িয়ে পড়ে: এত যন্ত্রণা দিলে কেন, যদি যন্ত্রণা সহ্য করার এতটুকু শক্তি না দিলে। কিন্তু এ চিৎকার কার উদ্দেশে? জানি না। শূন্যতার? হয়ত। "কারণবিহীন এক মহাপরিণাম ভেসে যায় ভেসে চলে যায়...'।

ঠিক এইখান থেকেই চলে আসে জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা। কবিতাতেও কখনও কখনও দেখা যায় এমনই কোন উদাসীন পঙক্তি। কবি যখন লেখেন— 'এখন বাঁশি বাজানো যাবে/ কেননা বুকের ভিতর অনেকটা ফাঁপা লাগছে'— তখন সেই বাঁশির সুরে জীবনকে আঁকড়ে ধরার কোন শক্তি পাওয়া যায় না। সেই সুর বড়ো উদাসীন। অস্তাচলের সূর্যের মতো। ঠিক এইরকমই উদাসীনতার সুর লেগে থাকে অন্য এক অসাধারণ কবিতায়—

'ভয়? কেন ভয়? আমি খুব
শান্ত হয়ে চলে যেতে পারি।
তুমি বলো ভয়। দেখো চেয়ে
অতিকায় আমার না-এর
চৌকাঠে ছড়িয়ে আছে হাত—
যে-হাতে সমুদ্র, ঘন বন
জ্যোতির্বলয়ের ঘেরাটোপে
শ্বাপদসুন্দর শ্যামলতা
রক্তপাত, জীবনযাপন।...'

[তুমি বলো ভয়/ প্রহর জোড়া ত্রিতাল]

এ কবিতার সমস্ত মানে দাঁড়িয়ে আছে দুটি শব্দের উপর— 'অতিকায় না' এবং 'চৌকাঠ'। 'অতিকায় না' এর অর্থ কী হতে পারে এক মৃত্যু ছাড়া? মৃত্যুই তো সবচেয়ে বড়ো 'না'— যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, চেনা যায় না। সেই না-এর চৌকাঠে ছড়িয়ে

আমার হাত। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আমি অনায়াসে দাঁড় করাতে পেরেছি নিজেকে। 'হাত' শব্দটার পরে একটা 'ড্যাশ'-এর ব্যবহার সেই ছড়ানো হাতের প্রতীক হয়ে আসে। আমার সেই ছড়ানো হাত এখনও অবধি ছুঁয়ে আছে শ্যামলতা বা রক্তপাত, অর্থাৎ জীবনকে। কিন্তু যে কোনদিন 'আমি খুব শান্ত হয়ে চলে যেতে পারি'।

এতটা পড়ার পর মনে হয়, কেন এত উদাসীন উচ্চারণ এ সব কবিতায়? কবিতা কি শুধুই যন্ত্রণা নয়? শুধু হাহাকারের কথাই শোনা যায় কবিতায়? অথবা শূন্যতায়?

তিন

'শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে সে কথা জানো না?

[শূন্যের ভিতরে ঢেউ/ বাবরের প্রার্থনা]

না, শূন্যতা শেষ কথা নয় নিশ্চয়। কবিতায় অনেক সময় শূন্যতার ছবি উঠে আসে ঠিকই। আসলে জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে এইরকম শূন্যতার মুখোমুখি তো হতেই হয় আমাকে। হয়তো তোমাকেও। তাই এত কথা। কবি যে নিত্য পড়ে চলেন পাঠককে। কিন্তু এই শেষ কথা নয়। বরং বাঁচার মানে খোঁজার শুরু এখান থেকে। নিজেকে ফিরে দেখার শুরু।

'শুধু ধরা থাকে হাত
হাতে হাতে কথা নেই কোনো
চোখে চোখ রাখি তবু কেউ কাউকে দেখতে পাই না আর

....তুমি নিচু হয়ে তুলে নাও একমুঠো মাটি
শূন্যে ছড়াও, আর চোখে চোখে না তাকিয়ে বলো:
ভেবো না। ভেবো না কিছু! দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

[সন্ততি/ মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়]

যখন চোখে চোখ রেখেও কাউকে দেখতে পাইনা আর তখন থেকেই ঘুরে দাঁড়ানো শুরু হয়। তাই প্রথম তিনটে যন্ত্রণাময় লাইন থাকা সত্ত্বেও এই কবিতা শেষ হয় পরিপূর্ণ আশা নিয়ে— 'দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।' এ বড়ো সহজ কথা। কিন্তু এমন কথা এমন করে কেউ বলে না আজকাল। বলেন কেবল কবি। তিনিই বলতে পারেন স্পষ্টতম উচ্চারণে—

'তোমার কোনো ধর্ম নেই, শুধু
শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরা ছাড়া
...তোমার কোনো ধর্ম নেই, এই
শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়া ছাড়া।'

[ত্রিতাল/ প্রহর জোড়া ত্রিতাল]

কত শূন্যতা আসতে পারে এক জীবনে! তুমি কেবল মুঠো ভরে তুলে নাও মাটি, যে মাটি তোমার ভিত্তিভূমি, দাঁড়ানোর আশ্রয়। তারপর তা ছুঁড়ে দাও ঐ শূন্যতায়। শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়া ছাড়া জীবনের আর কোনো ধর্ম নেই। প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকা দিয়ে ভরিয়ে তোলা আমাদের জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা, একাকীত্ব। আর ভরিয়ে তোলা কবিতা দিয়ে। 'মদ খেয়ে তো মাতাল হতো সবাই/ কবিই শুধু নিজের জোর মাতাল'।

বেশ, কবিতার হাত ধরে তুমি না-হয় হয়ে উঠলে কবি। কিন্তু আমি কি পারব? আমার এতদিনের ভাঙা-ছেঁড়া গ্লানিময় আমির বাইরে বেরিয়ে এসে, এতদিনের অন্যায়কে পাশে ঠেলে আমিও কি তুমি হয়ে উঠতে পারব? জানিনা। কিন্তু আমি নাই বা পারলাম। কবি তবু স্বপ্ন দেখবেন, 'মানুষ তবুও তার ভালবাসা রেখে গেছে পায়ে...'।

'মুখ থেকে লালা ঝরে চোখ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি পোকা
ব্যাগ থেকে নীল হয়ে ফুলে ওঠে দুধে পোষা সাপ।
দিনকে রাত করা কিছুই কঠিন নয় বুঝে
নিমেষে চোখের সামনে চুরি করে নিয়েছে পুকুর।
...
মানুষ তবুও তার ভালোবাসা রেখে গেছে পায়ে।...'

[মানুষ/ আদিম লতাগুল্মময়]

এই কবিতায় অবশেষে আমরা মুখোমুখি হই আমাদের এতক্ষণের খুঁজে চলা শব্দটার। ভালোবাসা।

এই শব্দটার কাছে এসে আমরা একসাথে অনেক কিছুর খোঁজ পেয়ে যাই। শূন্যের ভিতরে ঢেউ। পায়ের

তলায় মাটি। ভালোবাসার বোধ থেকে জেগে ওঠে বেঁচে থাকার প্রেরণা। জীবনের সমস্ত শূন্যতার মাঝে দাঁড়িয়েও মানুষ খুঁজে চলে একে।

'যখন এক জীবনের কাজের আমূল ধ্বংসস্তূপের উপর
দাঁড়িয়ে
ভাবি এইবার তাহলে কোনদিকে যাব
...যখন সেই স্তূপের ভিতর থেকে কেঁপে ওঠে শুধু
হাজার হাজার নিষ্প্রাণ আঙুলের উৎক্ষেপ
...ঠিক তখনই স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যে এই ভ্রষ্ট সচলতার
দিকে তাকিয়ে
আজ খুঁজে বেড়াই অন্য আরো অর্ধেক, কেননা
ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি!'

[ভালোবাসা অর্ধেক স্থপতি/ ধূম লেগেছে হৃৎকমলে] কবিতার হাত ধরে জীবনের ভূমিতে এসে দাঁড়াই। কবিতার শব্দে আমরাও বলে উঠতে পারি, 'গর্ব্ব আমরা আজ সমস্ত উড়িয়ে এসো বাঁচি।' নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়। ছড়িয়ে-দেওয়া খণ্ডতা থেকে পূর্ণতায়, আত্মমগ্নতা থেকে উদারতায়, সর্বোপরি আমি থেকে তুমিতে।

কিন্তু কে এই তুমি? কেমন করে ছড়িয়ে দেওয়া যায় নিজেকে 'তুমি'-র দ্বারপ্রান্তে? এই তুমি হতেই পারে কোনো ব্যক্তি-মানুষ। কোনো নারী বা পুরুষ। যদিও সেটাই সব নয়। আমাদের এতক্ষণের কবি শঙ্খ ঘোষ অন্য এক জায়গায় 'তুমি'কে বলতে চেয়েছেন এই ভাষায়— 'আমার ভিতরে-বাইরে ব্যাপ্ত এক না-আমি, অর্থাৎ তুমি।' ভালোবাসা বোধহয় এই না-আমিতে নিজেকে ছাড়িয়ে দেওয়া। তখন আমার বাঁচা হয়ে ওঠে তোমার বাঁচা। পৃথিবী-জোড়া জীবন স্রোতের সামনে দাঁড়িয়ে কবির মতো আমরাও যেন দেখতে পেয়ে যাই— 'ক্যান্সার হাসপাতালে সকলেই আজ বেশ হাসিখুশি।' এরই নাম বোধহয় জীবনে জীবন যোগ করা। কে বলে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই? কে বলে শূন্যের ভিতরে নেই কোনো ঢেউ?

চার

এতক্ষণের এই লেখাকে কী নাম দেওয়া যায়? প্রবন্ধ? জানি না সে দাবী এ লেখা করতে পারে কি না। আমি কেবল নিজের মতো করে অল্প পরিসরে ছুঁতে চেয়েছিলাম আমার প্রিয় এক কবিকে। কবি শঙ্খ ঘোষ। বলা বাহুল্য, এ রচনায় উদ্ধৃত সমস্ত কবিতা ওনারই লেখা। উনি আমার মতো অজস্র পাঠককে ছুঁয়ে আছেন সর্বক্ষণ। 'আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।' আমিও নিজের সাথে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম ওনার কয়েকটা কবিতা। অবশেষে বুঝেছি কত ভ্রান্ত এ চেষ্টা, কত মূর্খতা! কয়েকটা কবিতাকে আংশিক ও অপরিণত বুদ্ধি দিয়ে নাড়াচাড়া করা গেছে মাত্র। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি ওনার অতি বিখ্যাত অসাধারণ কবিতাগুলো কিংবা ওনার রাজনৈতিক চেতনায় বোধিত ঝলসে ওঠা বহু কবিতা। সবার সবকিছু নিয়ে নাড়াচাড় করার অধিকার থাকে না, যোগ্যতাও নয়।

লেখার এক জায়গায় ছেদ টানতেই হয়। এ লেখাও উপসংহারের পথে। কিন্তু শেষের আগে আচমকা দাঁড়িয়ে দেখে নিতে ইচ্ছে করছে আরও দুটো কবিতার কয়েকটা লাইন। দুটিই আমার ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত প্রিয়। সবচেয়ে বড়ো কথা কবিতা দুটোই ভালোবাসাময়। সুতরাং প্রাসঙ্গিক।

প্রথমটির নাম 'গঙ্গাযমুনা'। মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' বইটির এই কবিতা। এর প্রথম দুটো পঙক্তি এইরকম—

'আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার'

এইটে জীবনের কবিতা, কারণ এইটে তোমার। আমাকে আমার বাইরে অর্থাৎ তুমিতে ছড়িয়ে দিলে জেগে ওঠে জীবন। তাই তোমার কবিতা জীবনের কবিতা। আর যা কিছু আমার, কেবলই আমার, তা ততোখানি জীবন-ছোঁয়া নয়, বরং মৃত্যুর কাছাকাছি। তাই তোমার সামনে দাঁড়ালেই বুঝতে পারি 'বাঁচার চেয়ে বেশী বাঁচার' অর্থ। তাই যে কবি একবার লিখেছিলেন,

'রাত্রির লালিত দেহ ভরে দি কান্নায়' সেই কবিই তোমার সামনে দাঁড়ালে বলে উঠতে পারেন—

'এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো, এখন তুমি কথা বলো।'

হ্যাঁ, তুমি কথা বলো। রাত্রি যত ঘিরে ধরছে চারিদিকে তত তুমি কথা বলে চলো। গভীরতম অন্ধকারের রাজ্য থেকে তোমার শব্দ উড়ে যাক রৌদ্র প্রকৃতির দিকে। অন্তহীন এক নাস্তি যখন গ্রাস করছে আমায় তখন জেগে ওঠো তুমি।

'এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা হা করে এগিয়ে আসে চোখের উপর, দুলে ওঠে রক্ত— তখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী— শঙ্খের মতো গহন, গম্ভীর :

এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো, এখন তুমি কথা বলো।'

[ভাষা/ নিহিত পাতাল ছায়া]

সন্দেহ নেই, এত অনবদ্য প্রেমের কবিতা বেশী লেখা হয় না। তুমি বলো, বলো তোমার কথা, জীবনের কথা। দেখো, এবার কিন্তু আমি সত্যিই খুব শান্ত হয়ে চলে যেতে পারি।' এ উচ্চারণ আর উদাসীনতার নয়। এ উচ্চারণ এখন পূর্ণতার, প্রাপ্তির।

It's Still Rainning Cats and Dogs

Sunando Sarkar
Alumns
Department of English

It is raining cats and dogs when I have been asked to write something for this column.

The order comes from— I suppose— one of the "editors" of this column. And it— I am referring to the order— could not have been given in more stentorian a voice.

I dare not disobey him as he is known to live in one of the more militant neighbourhoods of northern Calcutta. More importantly I come back to college quite often and he is known, or rather heard, to possess a voice that matches the militant nature of the youths. of the area where he grew up. I don't want to risk the health of my ears. I possess only two.

It's stell raining cats and dogs. Cats I don't know much about. Nor do I care to know much. My relationship with the feline species has ceased to develop after my father beat me up one day.

It was not the only time that my father beat me. There have been numerous such memorable occasions. But that day, I was beaten up for a feline fault: stealing, and eating, fish. It does not matter that I stole, and ate, the fish. The fact remains that stealing. and eating fish is a feline fault.

It is, surprisingly and annoyingly, still raining cats and dogs. And Milieu is as annoyed as the other students of presidency College.

"Other" is not an oversight. He became a student of this college the day he was sought to be rusticated by a former principal of the college.

His brief life— he was born in the midst of the college fest in 1994 and, hence, is four years old— has not exactly been uneventful. He is one of the very few in this college to have been given marching orders. Another of the species was a gentleman called Subhas Chandra Bose. Milieu, however, is neither a gentleman nor a patriot.

But he proved himself to be more resilient. When the former principal declared— "Either I stay in college or the dogs"— he turned a deaf ear. He stayed, with not a little help from the other students. The college, surely, had gone to the dogs.

It's still raining cats and dogs. The dog is now considering leaving the last of the leaves of bread I bought for him for other lesser mortals.

He can afford to. Yesterday, another Presidencian— she left the college before me but, like me, comes back— brought the dog some meat to eat.

The dog leads a better life than me. I did not have any meat yesterday. I could not afford to.

In India, one's standard of living is directly proportional to the amount of meat one has, so am I told. I yearn for a dog's life.

Milieu underwent vasectony last year. He was forced to.

I got married to one of my clanmates this year and I don't want to be forced into undergoing that operation just now. No, I don't yearn for a dog's life any more.

It's still raining cats and dog, 45 minutes after I was asked to write something for the college magazine.

Notes Towards A New Theory of Culture

Tirtha Prasad Mukhopadhyay
Department of English

I dedicate these notes to Prof. Arun Kumar Dasgupta, formerly Professor of English at Presidency College and at the University of Calcutta, the beauty of whose soul lies beyond my limits of contemplation.

What is culture?

I wish to have recourse to a specific etymological significance of the word before trying to construct a discourse of culture. Surely, one of its meanings suggests growth or cultivation as in agriculture. *to grow* or *cultivate* implies organic growth, insemination or breaking forth of the idea.

Etymologically, this sense is close to the Sanskrit *krishti*; the stem *karshan* means to cultivate, to grow.

Tagore speaks of culture as transcendence. He assumes that we can express ourselves through our modes of existence. He believes in man's subjective efforts to create an artful life. In some of his late prose works he speaks about the value of an artistic or cultural transformation of social and civic systems. We can take an example to understand what Tagore means. The pitcher, for instance, is used to carry water. The pitcher serves the needs of life but the same object may be

painted or decorated. At this moment the ontological status of the pitcher is transformed into an art object. Tagore advocates a need for this total orientation of our perception so that the sturggle for existence or survival is continually defeated, transformed and recreated by an aesthetic intelligence.

Such a theory adopts the view that the entire universe of man has an organic potential which can be manipulated. This principle may be compared to the gardeners' efforts of cloning a plant.

Tagores concept of culture is derivative upon a tradition of philosophy which has its roots in Bhartrihari and Buddhist. Even Christianity has contributed towards the formation of Tagore's ideas of culture. We may call this the Brahmo concept. Tagore says that for him the perfect expression is a product of an interplay between himself and the rest of the world that surges through his personality in waves.

I have seen in this idea of Tagore's an important element of all philosophical thought arching a great anthropological horizon. This is the question which resolves itself into a single statement— the relationship between the deific and the human. Tagore believes that the human being is wholly subsumed into the deific. In this context culture— the whole, comprehensive question of cultural expression— is to be explained as the Deity's writing of itself, the expression of itself through human dimension. In Tagore we have seen the fact that art is reflection of the artist's perception of the Deity. Jibanananda has anticipated this position for Tagore whom he sees to be writing in a tradition of syncretic doxa from the Platonic, Judaeo-Christian to Buddhism and monistic Hinduism.

We may oppose this Tagorean notion and culture to the nonphilosophical, magical, anthropic expression of culture. By "anthropic", I intend to signify a particularly primitive, unsystematized corpus of knowledge— it may be an evolving corpus but it tends to be written down as certain accepted gestures and sign of a race of people rather than be something monolithic and be written down as a constitution of principles. We may say that the dissemination of this kind of culture is seen among tribal populations who practise living as oral nonliterate cultures. For these tribal and primitive groups, whose beliefs still simmer with the rudiments of the nonliterate, oral and autotelic intelligence, culture is a projection of a voice. But here the individual's expression is uncontrolled. The individual is a victim of the expressive power of culture.

Now, the cultural sign— the living texture of the entire cultural, aesthetic anthropo-philosophical signifiers, as Derrida would call it— is never bound by itself is always on the verge of an inflation. The field of culture can never be catographically distinguished. One cultural voice mixes, dissolves and is recreated as another voice, Now, therefore, these two traditions which we have just noted— one, the sophisticated, academical or institutional concept of culture which is represented by Tagore and the other which is the unsophisticated, folk, oral and nonliterate culture are not segregated rhythms but merge with, attract and respond to one another. What we have is a perfect example of cultural grafting, a hybrid culture. Culture is always hybrid. There is no pure culture. Almost all cultural rituals or gestures, public and private consist of movements which reveal aspects of a different cultural ritual. We observe this phenomenon in the act of speech. Let us consider the way in which two individuals speak. What we see in this action is one individual signalling towards another. The signal, the word evokes a movement in the other individual's stock

of signals or words. It is like a magnet touching a pattern of iron filings. The pattern now changes that has been successfully evoked in the consciousness of the second individual. The signalling word is transferred and absorbed and has no identity except that of its dead, past form, a memory. Its significance lies entirely in the answer or reply which the second individual or the listener now gives.

We may at this point return to the example of the botanical graft. The grafted stem has no identity of its own because it has transferred itself— its potentiality— on to the mother plant. But the mother plant also loses identity. We have a new genetic entity, a plant which is no more anything like what it was in the past but a new plant which has received the graft and has assumed an entirely new identity. This plant which has received the grafting does not have a history. It is a totally unhistorical being. The new plant severs its connection with history the moment it receives a graft.

Analogically, the culture of a people changes the moment it receives a foreign impulse. It becomes a different cultural organisation. It is a gift perhaps a gift of nature that our cultural identity is never fixed but is constantly receiving a different configuration. It is the greatest boon that the humanity has received that we can deny our history and assume a new identity every moment. It is in the celebration of our perpetual renewal that we can identify ourselves most fully.

Let the historicist-who believes that history is everything, that tradition is everything, or heritage— despair that culture is not historical but is to be defined as what it is only in its living, present forms.

Where does the syncresis take place?

I shall take an example in order to study the confluence of cultures. The *Baul* from Birbhum has always haunted our imagination because he seems to be a figure absorbed in himself, rapt in contemplation and, above all, feeling the pulse of a rhythm. A wave is transmitted from his waist upward through his torse and spills over in song. There is a *jhumur* around his ankles which jingles in that rhythm. The most mysterious part of the *Baul's* music is the wire percussion, bordering on the incongruous but then it gets harmonized to the song. The percussion and the rhythm of the *jhumur* releases the total effect, the magic. The *Baul's* musical effusion reflects a transfiguration of elements which pervades the cultural horizon of a primitive and ethnic civilization. The rhythm of the tribals of Bengal plateau and their avid perception of the character— I may call the spiritual character, in the absence of any better term which could represent the whole of the plant, its total being as an expressive form of nature— of the hardwood forests of the plateau, of its trees, the sal or the *mahua* is simulated in the notes of their song. It is with these notes that the *Baul* starts to sing. He inseminates himself with these notes. In our terms of discourse the *Baul's* song has received a graft and has now itself become a creative sign or modifier.

The older *Baul* is today rarely to be seen because he tends to vanish and transmit his signifying spirit to the mass culture, the microphone and the electronic medium that has begun to affect our lives.

If one remembers the dictum that the whole of existence is changing all the time then one faces an inevitable opposite conclusion that nothing is able to remain as it is, and that the other name of absolute change is an absolute permanence of principles that ensures that the change always take place. When you see an organism you realize that it is growing and approaching you. It is the nature of an organism that it grows and alters its former self but that as long as it has not reproduced

and assured its continuance in its offspring or if it has not been as yet dead and interned in earth you also realize that it is the same organism that you are observing. It remains as itself despite changing. Since culture is the organism in whose bosom we live we know that it is going to help us sustain ourselves or, may be in its wrath, take its toll from us and destroy us.

I have seen in the *tulsi* the meaning of our culture. The *tulsi,* a tender plant is a metaphor of our concept of culture. The Indian civilization has worshipped it like a deity. This seems to be a fairly proper attitude to the perception of the deific. We worship the *tulsi.* The housewife of the previous generation and even to some extend the villager today associates chastity and the ideal of self-giving to the worship of the *tulsi.*

The *tulsi* is usually planted on a stump of mud. The stump is made of clay and possesses cuboid or geometrical configuration. It has some ornate designs on the outer surface of its walls, especially artful patterns, shaped like the conch, one dimensional and going round it like a frill of impressions. The wife places a lamp on the alter and blows of conch. The sound fills the evening air.

I compare our culture to the *tulsi* because it is a aplant which resembles the being of culture. It is a samll plant but it is strong resilient and perpetuates itself out of its own seeds. When we worship it we invoke its power. The wind shakes its leaves and boughs but it has an unshakable stem. The *tulsi* invites us to wonder at the strength of that which is liable to escape notice but which is also unperishable.

No one can conceive a sense of culture without having a vision of the organically palpable exterior in which one lives. He is impelled by a sense of helplessness that it is not possible to extricate himself from the living signs of its culture, the language he speaks, the ethical taboo he accepts or even the gods of technological machinery— that is to say, the implements which enhance his style of living, or retards it— and the elements which requires his habitual submission towards them. The human being is the scapegoat of culture, the sacrifical victim. He has no independence of his own but a total dependence on what is not his own. He can hope to survive by playing his role in low key. The lower the key of man's existence the higher is his understanding of culture. Playing a subdued role implies that he has submitted his ego to the demands of cultural supremonster and has let his horrific deity rule him wholly and unscrupulously. We have to be cautious, therefore, that we are merely hunted animals in a game whose rules are too perfect to be understood and too unsympathetic to be justifiable by our capacity to reason.

I have spoken of two striving sprints of culture which I shall now consider:

- The Tagorean which is a methodologically perfectionist mode
- folk, non-literate, ethnic

There are other currents which I do not take into account because they shall form subjects of my discourse elsewhere. I consider only the two mentioned above for a certain vital purpose.

Let me oppose the first to the second, the institutional to the ethnic, the totalitarian to the subcultural. Like two things having affinity for each other these are at strife and the second is in danger or in the hope of being consumed by the first. The institutional culture of the Bengali people are about to eat up the primitive, the ethnic culture. The government takes care to preserve the artifacts of ethnic culture and reach financial assistance to the practition-

ers of folk culture. The final result is indeed the opposite of what has been intended. The establishment machinery ends up subsuming the products of a firmly rooted culture, like a harvester machine extricating the grain from the paddy. At least in the heart of a city the cultural relics of the past are circulating along its streets like blood cells through arteries. Nothing is important in the ant-walk of civilization. It has a pattern of its own. Man does not leave trails behing him but his incessantly creating a new trail, a new pattern.

I have suddenly discovered that in the world in which I have my being, the world immediately around me, the elements of the primitive culture are still shricking in pain yet to be devoured by the impersonal, controlling power of pro-establishment governing agencies. On College Street where I have my being the book devours the intense struggle and sculpturesque simplicity of the bookseller, exotic names of a different Judaeo-Platonic European culture allures a son of the soil. The man who belonged to his family and his habitat, in most cases laid low and cringed, is now poised to take the next flight to eternity, or the ramparts of an imperialist University in Europe or America. Now it is true that our intellectual pursuits are oriented towards the West but, even as we acknowledge we understand that the phenomenon is not irreversible. We never know at what point of time our culture is going to take a turn.

Reality and Consciousness: A Sceptical Viewpoint

Santanu Chakraborti
Second Year
Statistics Honours

The questions of whether the world is real, and if so it is explicable and intelligible to all, is a problem that has concerned thinkers and philosophers of all ages. Reality is meaningful if and only if we have knowledge of it. And knowledge of comething presupposes a co-nsciousness. In this article we shall deal with the sceptical viewpoint of the world and proceed to demonstrate how no knowledge is certain and finally deal with the problem of consiousness.

The Nature of the World in Indian Philosophy

Before we actually grapple with the topic, it is perhaps advisable to define God or the supreme being since we shall have to define the world in terms of God. For our purpose it shall be sufficient if we define God as Father Copleston SJ defined in course of his debate with Bertrand Russell viz God is a supreme personal being— distinit from the world and creator of if. Of course this definition rather excludes the content that God is both an Absolute and a living principle and also seems to prevent any interacteons between this world and God, but it shall suffice for our purposes.

In Indian philosophy, the world is simply an effect of God who, therefore, must be its cause. And since a cause is more real than the effect, the world is relatively unreal with

God being the Absolute Reality. The workings of the cosmos are seen as an interaction between two principles of being and non-being with God as the upper limit and matter or *prakriti* the lower limit. Matter always seeks to be transformed into spirit. When enlightement dawns on the entire world, the purpose of God is realized and the world is restored to its origin in pure being. However the fundamental point in all this is that the cosmic process itself confrims the unreality of the world by the self-contradictary nature of evolution, in which, as we have seen, there is a struggle of opposites. And the real is always above and separate from all contradictions and opposites.

The world therefore has to be understood (rather attempted to be understood) through the concept of *maya*— approximately translated as illusion. It posits that the world is "not essential being like Brahman, nor is it mere non-being" (S. Radhakrishnan). It does not, however, imply that the world is an illusion or non-existent absolutely. Only that it is a delimitation from both unmeasured and the immeasurable a state from both unmeasured and the immeasurable a state of plasma if you like.

In all theistic philosophies it is stated that God is real but is unknowable. This has been done, it seems, to avoid the most fundamental question viz why did the supreme being create a world in the first place? We cannot assign any reason whatsoever because in doing so we immediately confer upon God mortal human characteristics. The Christian viewpoint of god having created man in his own image appears, to be a manefestation of self love and megalomania which, as we all knew, are prety underirable human characteristics. In every religion God is above the ordering of time and space. It is inevitable therefore that in accepting the reality of God we establish the unreality of the world and our physical selves.

The Unreality of the World— The Problem of Knowledge

Reality, as we stated earlier, means a knowledge and consequently a consciousness of reality. But do we knew anything at all for certain? Consider the thought experiment devised by Bertrand Russell in 1921. He said that the world including everything in it, was created just 5 minutes ago. Everything that we see around us confriming opposite, the buildings, fossils, every humans, were placed there the same five minutes ago only to give you the impression that the world was *not* created five minutes ago. It is no use saying "Ah! I remember the time three months ago when I fell in love". This though along with all others have been implanted in your mind five minutes ago. As such is there any way of knowing anything for certain? Russell argued there isn't.

René Descartes tackled the problem of knowledge much as Euclid tackled the problem of geometry. First there would be facts utterly certain, from which would follow axioms which is then could allow us to infer new facts with certainty. He was amazed to find that there was nothing at all he could be certain about. For example you may know for certain that your name is Tyrannosaurus but there is always a doubt, isn't there? Because your name may actually be Stegosaurus and to give you the impresseon that your name is Tyrannosaurus. Chances are slim of such an eventuality but they do exist. Nothing is certain.

In another famous thought-experiment it is posited that while you were sleeping at might everything has doubled. Is there any way of measuring this change? Not really. What you would measure with has also doubled and there is no way you can compare against any

absolute standard. Given that, did a change take place at all?
Jules Henre Poincare, leading light of the antirealists (who say that there are no evidence transcendental truths) said there was no change at all if it is impossible to detect it.

Who Are You?— Attempts At Understanding Consciousness

"Cogito ergo sum" said Descartes— I think therefore I am. Using the Sause and effect principle he argud that God exists and therefore the world exists. Since God is perfect he would not deceive us into believing an illusory external world (Notice the similarily with Indian Philosophy).
The existentialist principle runs counter to this. Sartre states that the consciousness which says "Iam" is not the consciousness that thinks. i. e. recognition of an object is always accompanied by a consciousness that doubts the object as uncertain. The consciousness therefore does not actually consider itself but a pre-reflective consiousness— this does not mean that the process has to carry on *ad infinitum*. Consciousness is such that for it to exist and it to be aware of itself is one and the same.

What is consciousness actually? Consider that a little bit of your brain, corresponding to a certain function, is replaced by a computer chip performing the same function. But by bit your entire brain is replaced by computer chips. What finally remains is exactly like you in thought, actions, emotions, everything: but is it you ? This approach is known as functionalism. It states that what is unique about oneself is entirely due to the arrangement of electrons in your brain. In other words the theological concept of the immutable soul is untenable.

What is it that acutally makes the 'I person' distinct from the 'You person'. We can look upon the Other as not being me, but I can never prove its existence since the Other is by defenition another 'I' outside my ken of experience. And of course, any valid proof must be based on what is within my experience.
This brings us to the 'Other-minds' problem. What if you were the only person with a conscious mind and everyone else were an automation programmed to behave and respond exactly as a human would there is no way you could find out if they indeed were automatons when we assumed without even thinking about it, that everyone else has a consciousness we also do something mathematically ridiculous and inconsistent— we octrapolate from one sample — namely ourselves. We think that because we have a consciousness, but we assume we are correct simply because the mind refuses to believe otherwise. Obviously then we have to be as doubtful of consciousness as we are of reality.

Imagintions

We do not, in actuality, imagine, anything completely novel or original. Whatever we imagine is based on reality (well, whatever we perceive reality to be) For example an unicorn is a horse with a horn. Little green men from Mars are merely men— little green ones of course. Our minds are trapped in the reality we see. We can only collect kits of reality, put them together and imagine we are imagining. We are all trapped in a reality which is itself uncertain and can't even escape from it through imagination.
Reality then is illusory, consciousness is inexplicable (if it exists at all), knowledge is uncertain and imagination is a prison rather than a sanctuary. Ours is indeed a strange world to survive in. Can you conceive of any world in which this is any different ?

From the imagined to the Illusory

Notes on the post-Indian Nationalisms

Bodhisattva Kar
Second Year
History Honours

Authenticity of the Jargon

The title of this article suggests a certain gesture of directionality: it is as though there has already been a definite shift in the pattern of the constructs of the 'nations'. Such a gesture can easily be misunderstood. A teleological bias can be read into the title: as if 'imagination' is destined to transform itself into 'illusion', as if the unreal does not acquire any tension in its developmental process, as if the imagined always precedes the illusory. I wish to pit the sub-title against the title. The word 'post-Indian', I hope, is odd enough to drive my point home: that the much-trumpeted 'Indianness' is an exercise in temporality. The space is not a space unless it is ordered by time. On the other hand, contemporaneity— the form in which homogenous time is usually conceptualized— is attested by a socio-spatial cartography. The tension caught up in this dialectic is what I want to address here.

Us as Them

Nationalism is both a politics of de-differentiattion and a totalizing dynamic of Otherization. The centrality of this paradox to the nationalist

discourses appears to be— whether I like it or not— universal. But what does this paradoxical formulation actually mean ? At one level, the nationalist ideology attempts to extend a horizontal Sameness[1] by discursively withholding or suspending the alternative identities (such as class and gender); at another level, nationalism rests upon and consolidates itself around the constructs of the Other(s). The complex phenomena of the production, distribution and consumption of the Otherness(es) were always already embedded in the semantic struggle for the definition of the Self. The Indian nationalism, which announced its representative and interpretative monopoly of the Self of the 'nation', proposed a naive binary opposition (an either/or structure) between the (Indian) Self and the (British) Other. This in turn allowed the Indian nationalism to legitimize its claim as the one and only Other of colonialism. But, in fact, a perception (re-cognition) of the Big Other (had Lacan been a sociologist, he would have termed colonialism thus) led to the formation of various Little Others within. These Little Others were glued together to be projected as a unified image of the Self of the 'nation'. I have tried to elaborate this argument elsewhere.[2] What I need to mention here is the specificity with which the 'Self' insisted on the disavowal of the Others. I want to put my finger on the disavowal of the plurality of the Alterity. By suppressing this plurality, the Indianness attempted to represent itself as a transhistorical phenomenon. But now, as I want to point out, the so-called 'separatist movements' re-perspectivalize the temporality inherent in the political space defined as 'India'.

India Demapped

In an illuminating essay on 'Maps and the Formation of the Geo-Body of Siam' Thongchai Winichakul demonstrates how the encounter between two types of geographical knowledge led one to be subsumed under the other.[3] The geographical range of the power of the state, we may further Winichakul's argument, has also a discursive limit: the overstimulation of locational realities (centre vs. peripheries) must ultimately be blamed on an Other— either the centre or the frontiers. So, it may be argued, 'the rationality of expansion proposed by the metropolis'[4] haunts the ideological project of cartography. On the contrary, the marginal wishes to view itself as the unmapped, if not as the unmappable. The discourse of the margin shows a desire to remain uncontaminated by the central/focal images. Yet, for the marginal, the experience of mapping has consequences that cannot be avoided. It is no more possible to throw out the bath-water while retaining the baby: the United Liberation Front of Assam also has its own maps of the 'proposed sovereign independent state of Assam' in order to insert *the proposed* into the present.[5] The contemporaneity of India is thus renounced, but only at the cost of rearticulating and fracturing the present. It is not only, then, a struggle over space, but also one over time. The signature of the Self demands to inscribe itself in this world of the Others.

The Will to Illusion

The late capitalist technology has so expanded and perfected the techniques of representing the real that— for Eco and Baudrillard, at least— the very ontological status of the real itself has been called into question. The spectre of nationalism hovers over this newly reawakened unreal. Are the nationalists transposing "the spontaneous power of the imagination, the experience of self and affectivity, into the remote and the archaic" ?[6] Are these people practically leading themselves out of 'mode-

rnity' but for reasons that could only be conceived in the terms given by the very project of modernity ? These are the questions generally raised by the theorists who believe in redeeming the project of modernity— the Habermassians, for example.

But has chronology any legitimate demand upon nationalism ? I am certainly not claiming eternity for nationalism, but I mean to say that we are destined to drift constantly between the nationalism-is-eternal claim and its historicization (or, demystification). We are no more in a position to render its wholeness. As Roland Barthes observed in 1956, "if we penetrate the object, we liberate it but we destroy it; and if we acknowledge its full weight, we respect it but we restore it to a state which is still mystified."[7] I fear, it is also true of nationalism.

Let us have a look at what Mussolini thought about it: "I have always declared... that there is no such thing as a pure race! The belief that there is, is an illusion of the mind, a feeling. But does it exist any less for that?"[8] For Mussolini, the will to illusion was of course not opposed to the will to power. The Fascists wanted to grasp the real which had already escaped the Italian society.

Now allow me to come back to our story. Do the so-called post-Indian nationalists consciously further a politics of illusion? If so, does the will to illusion go hand in hand with the will to power? Well, the extraordinary presence of their discourses is effected through their very absence, through their unbridgeable distance from the real, from even the possibility of the real. The State which is both the supreme real and its magical double defines them as the 'terrorists'. Terror, we all know, is necessarily disjointed. There can be no 'reign' of terror as such, there are only 'moments' of terror. The discursive technology of terror is also discontinuous— we have a whole range of floating images: guerrilla attacks, local mythologies, suppressed knowledges. "Taking up these masks, revitalizing the buffoonary of history, we adopt an identity, whose unreality surpasses that of God, who started the charade."[9] For the leaders, the will to illusion may be interwoven with the will to power. But for the masses— to whom truth/falsity is always anonymous— the movement, I believe, appears to be an ironical art of disappearence, of withdrawal. This plural-as-singular identity is condemned to a systematic dissociation from within. The post-Indian will to illusion stems from a fundamental cynicism, a disillusionment with the real— the body politic. This collective stupefaction, as Baudrillard argues, is "alive in the hearts of people, but haunts just as well the processes of events."[10]

The people, I hope that they still exist, have become tired of real-izing their 'dreams'. The homogenizing project of the real destroys all memory of a birth-process which embodies a multiplicity of pasts, Now that the focal/the real itself has become fragmented into dissident micro-spaces and micro-times which fracture it into a constellation of unidentifiable voices and a plurality of alienable meanings, the decentred space/time of the marginal are also facing the same crisis of centrality/reality.

Notes

1. "[The nation] is imagined as a *community*, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of people, not so much to kill, as willingly to die for such limited imaginings." Benedict Anderson, **Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationslism'**, Verso: London and New York, 1987, P. 16
2. Bodhisattva Kar, **'Unish Shataker Banglaye Aparikaran: Ekti Prastabana'** (An Introduction to the Otherization in 19C. Bengal); soon to be published in Itihas Anusandhan XII

3. Thongchai Winichakul, 'Maps and the Formation of the Geo-Body of Siam' (ch.3) in Stein Tonnesson and Hans Antlov eds. **'Asian Forms of the Nation,** Curzon: Richmond, 1996, pp.67-92.
4. Nelly Richard, 'Postmodernism and Periphery'. Transl. Nick Caistor, published in **Third Text**, 2, Winter 1987/88, p.6.
5. 'National Question in Assam' by the ULFA in **'Symphony of Freedom: Papers on Nationality Question'**, All India People's Resistance Forum: Hyderabad, 1996, p.154
6. Jurgen Habermas, **'The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate'**, ed. and transl. Shierry Weber Nicholsen, Polity Press: Cambridge, 1989.
7. Roland Barthes, 'Myth Today' in **'A Roland Barthes Reader'**, ed. Susan Sontag, Vintage: London, 1993, p.149.
8. Benito Mussolini, interviewed by Emil Ludwig. 'Talks with Mussolini''. in **'The Penguin Book of Interviews: An Anthology From 1859 To The Present Day'**, ed. Christopher Silvester, Penguin Books India: New Delhi, 1995, pp. 301-311.
9. This bit of Foucault is quoted from memory. At this moment I am not able to trace it back to its 'original place'.
10. Jean Baudrillard, 'Toward A Principle of Evil', in M. Poster (ed.), **'Selected Writings'**, Polity Press: Cambridge, 1988, p202.

Defending the Indefensible

Kingshuk Chatterjee
First Year
History, Postgraduate Level

In 1996 general elections, the average voter turn-out all over India was between 50 & 55%. For most states, the figures continue a decline that have characterized the last few elections. Observers of politics attribute this to voter-apathy. The ruling parties somewhat proudly suggest that the failure to turn out was because half the nation was hopefully confident that the ruling parties would be returned on the strength of their achievements by the other half— without stopping to think that all of them might not have the same idea of a bright future. Similarly, the opposition parties believe that those who didn't vote did so out of the disgust evoked by the ruling parties, while most of the votes cast were rigged. Revolution— minded people on the left and the right see in this stay-away-from-the— polls syndrome onset of yet another— decline of liberal/bourgeois democracy? I have been assured by one such friend of mine that the right wingers (reactionaries, as he put it) are already preparing for a civil war in the forests of Madhya Pradesh (Did I hear anyone laughing obscenely?)

To the meanest intelligence the spectrum of opinions would seem to have only one meaning— viz. Indian politics has reached its nadir in public opinions since 1947. One might even say, that is not the case— Indian politi-

cians can stoop even lower. And rightly, too. But of late I have been wondering as to whether Indian politicans are stooping low at all. If anything, they are upgrading India's democracy with a level attained by countries as Japan, South Korea and Italy where the nexus between the scales and the sceptre are equally strong. Also Indian politicians invoke issues (which misguided people call 'medieval') similar in nature that did Iran proud after 1978 and Israel since her birth. They have also set up a link with the underworld— a collusion that puts to shame all but pre 1990 Italy, post 1990 Rumia and Columbia on either side of 1990.

So what is Iundamentally wrong with Indian politicians. I would say, nothing! Or, if at all, the very slightest. For there is a tendency of pretension among them. Indian politicians have been unable to discard their holier than thou attitude. No sooner is fervent patriot of a leader stranded on the mire of 'political miscalculation', than all others start denouncing him as 'unpatriotic', 'venal', 'irresponsible,' 'fiddling with public confidence'— and all such not. Even this is understandable to the broadminded. Politics today is a competitive field. Cynics are nearly ritht (harshly though) when they say politics is for people who like a bit of plunder to go with a lifetime of blunders. That is, what with politicisation of illiteracy, industrial backwardness and agricultural quasi-modernism politics is the most remunerative vocation. Thus a promising competition has to be kept out once he has been brought down by circumstances.

How can our democracy function in any less than perfect manner? We choose our representatives with great care so that all sections of our population are elected in strict proportion to their number. We elect a good deal of people with criminal records ranging from murder suspects to rubbers— although invariably the allegations are "politically motivated" and never proven, and even if proved no doubt the evidence was apocryphal. We elect only a few women not because our attitude to them is medieval, but because we are confident that our male legislators understand their problems perfectly. And righty, too. Our legislation, from the bucolic types to the saffron-clad fire-brands, all are emancipated, thanks either to Manu or to his West Asian counterpart.

The bulwark of this democracy of ours are our political parties. If the strength of a democracy is measured by the number of platforms for opinion, then our political parties alone will make India pass the test. In India there are more political parties then there are politicians to man them. Every party has an opinion that makes it fundmentally different from all others. What that difference might be is usually explained in a manifesto that generally makes nonsense seem intelligible. This difference is so helpful that a party which starts off in a general election subject to juicy appraisals from two other parties, is found after the polls to be supporting the one against the other— and no questions asked (expect by the party that now has itself candidly spoken about by the other two).

Still, thanks to a press too-learned-by-half, one can generally learn which party is on the right, which on the left and which sits on the fence.

For instance, there is that party on the right which comprises of religious souls. They are rightly convinced that Pandora's box of troubles can be closed shut if only the magic wand of 'Hindutva' is waved. While some people think this violates our constitutional adherence to secularism, they generally miss a point. 'Hindutva' is a very inoffensive factor. For, Hinduism means everything under the subcontinental sun to everybody. It could mean Vedic ritualism, Vedantic intellectualism, Charvaka scepticism, Bhagavad fatalism, sublime mysticism or it could mean anti-Muslim activism as in northern India. Never should it mean Vivekananda's philanthropism. It could also

mean economic protectionism at home and export promotion abroad which is to stiffen India's fifty years old infant economy. It also means uniform civil code (preferably a Hindu one) because our hearts bleed at the condition of women of a particular community, not of Indian women as such. It never means an end to a privileged income-tax bracket for Hindu joint famly. And the best part of it is that Hindutva might even encompass secularism, as secularism is directly related to tolerance of other religions and tolerance is a trait peculiar to the Hindus. And this tolerance is genuine, mind you. It's not that Hindus were tolerant because they couldn't beat the dissenter black and blue earlier, or that they are tolerant only of the views that concur with them. Even now they are not intolerant, as they are made out to be. It is only that all have conspired against the Hindu for long, and now pressed hard the poor soul is fighting back.

We also have parties on the left that speak about social justice and workers' rights. Although antiquated idealists to exist on this platform, yet generally this wing have people with sober understanding of democratic politics. Their agenda for social justic hinges largely on for reservation job the backward classes. Critics might observe that by creating this plebian aristocracy efficiency is being sacrificed— but how much efficiency had we ever, anyway? If anything, this is justice, not discrimination. For, centuries of repression in a pre-colonial society most certainly need be avenged in a post-colonial one.

Their agenda also include useful programmes like land-reforms. They are quite convinced that generally a landowner with, say, 30 acres of land should not be deprived of more then 10-20 acres. And if indeed he were deprived of more, the holdings should be so parcelled out among tenant farmers and share croppers that they become uneconomic and so have to walk back to the landed magnate at the and of the day. With such land reforms, they have successfully won the confidence of both parties— landowners and tenants.

They have also succeeded in what socialists elsewhere have failed. While they have not actually broken with the capitalists (the bigger ones) they have given the workers freedom from exploitation by giving them a right to leisure, They make use of this right in the name of strike, and the social justice seekers see to it that the workers are paid adequately for that.

There is also a party of the centre that has been sitting on the fence for over a hundred years, and in so doing it has controlled the hdding within the fence for about half that time this partly comprises of the pick of the lot from all professions, and allegedly speaking for all— may they be bearded academics worrying themselves sick over Indian economy, or people with four decades of alleged possessiveness (be it over 112 bags of cement in the '50s or telecom items in the '90s). This was the party that gave us a one-man cabinet (albeit in a large council of minister). A women's cabinet with one man in it (who had unintentionally almost given the opposition a democratic farewell in mid-70s) also did the party proud. Of late it has been politically so victimised that it has been suggested that its next session would be held behind the confines of the Tihar jail.

We also have regional parties that outnumber the regions they represent by about 6 to 1. All these parties promote regional interest only in order to promote national interest and development. Critics say they have not much to say on the score of development— but then critics will say anything. As to national interest, they have a point. Unless the condition of the provincial parties (not, mind you, of the riffraff) improve vis-a-vis the centre, the country as a whole, will not progress. So now that we have a federal front at the centre, India's problems are surely going to be solved

presently. For, instead of a hawkish central government we now have one whose mettle bears a striking resemblance to a jellyfish—known for its flexibility.

It remains to speak of those angels in human shape whose constant concern is our welfare—our political leaders (up with them!). They are 'the twentieth-century saints' who, while used to commute on foot, had reluctantly to switch over the A.C. railway wäches on aircraft. Nor indeed do they do so unless they are forced by their sense of duty to the people they represent— and that too, because the expenses are willingly borne by the Indian citizen from his amply-stuffed purse. They are nationalists if they are anything, and little else besides.

Our politicians are particularly well endowed with grey matter. Their sense of humour might vary from the bucolic sort of a Bihari rustic, to its utter absence in his kinsman from U.P. who insists on compaigning with a rifle slung across his shoulder for the fun of it. But when it comes to people with brilliant insights— they are a dime a dozen. For instance, when a party comes up with about 40% of the seats, the rest of the parties with 60% of the seats between themselves are said to have received a mandate to resist the former. There are also people who believe that India should be a Hindu state where non-Hindus, especially Muslims should become second citizens. There are yet others who thirll that by securing one-third represenlation for women in central and state legislatures all inconveniences due to the accident of sex can be done away with. What is most illuminating, however, is that there are yet other people who think all these things stand to reason. In all we have quite a variely of specimens, and interesting ones too.

There is, for instance, that avuncular Harianvi who had identified himself with the cause of the rural riffraff (who else would have weighed him in sikkas on his birthday!). One might lament over the eclipse of this esteemed man who had the modesty to nominate himself to the office of Deputy P.M. not for the sake of power but that he may serve the nation.

Or that other man who has made a sort of record. He had been weighed down with the responsibility of several part jobs in the last four out of five council of ministers for three different parties. No doubt had he not been malevolently waylayed by conspirators in the Hawala mire, he would have continued to shoulder India's burden (for a fourth party)—a burden that Atlas would have shrugged.

There is again another man who started as a behind-the-desk revolutionary, leading a party that torched buses and trams when fares increased by one paise. He is now a master of balancing political forces, and of defending an order that he was ideologically bound to replace with a better one. This conversion was no opportunism since he fondly allowed a close relation of his to become a part of that same order. Today he has to accept hikes in fares with equanimity since the view from within an office is diametrically opposite to the one from outside. With sceptre in such hands we know we are safe.

There is also another man who blazed the polls on the issue of kickback, taken by the party previously in power while sanctioning a lucrative project. He promised to scrap the deal—and this was no gimmick He firmly negotiated a fresh deal that was cheaper. Gossipmongers say that the revised deal is cheaper because the end product is also inferior. But then they are Gossipmongers. Appreciation for nationalism is certainly at a discount.

Which explains why the most nationalist coterie of politicians, have been forcibly kept out of power. It comprises of the 'wrong man in the right," a physicist, a prince charming with a shining pate and a lady with a beatific smile. They together, have performed the most crucial test of a nationalist. It is said that we know a proponent by the identity of its

opponent. This coterie have started by pointing out their enemy. And they have done this in the spirit of tolerance— by pulling down an unused shrine (albeit historical) to build another for a hero who was never born. Here lies their greatest tribute to the nation. In addition to identifying "enemy of the people" and shaking somnolent citizens out of lethargy, they have also stood by the most accepted philosophical doctrine that came from India— that of triumph of Faith the Infallible over Reason the Fallacious.

For all their differences, India's politicians are at one on three issues— alleviation of poverty, programme on education and the question of national defence.

Poverty is a serious problem for India, though not as much as malicious westerners make out. India has tried to tackle the problem in two ways. Indian bureaucrats and academics had tried to lower the income level denoting poverty line. But the image of half-fed, ill-dead Indians continued to trickle out. So Indian politicians chose a better way that had two facets. One— in election time, or at political rallies they encouraged people to turn up for a bit of money. But more importantly they started to set a personal example of how enterprise can make a fortune out of anything— even ideological bankruptcy. One needs only the right mindset to make a killing out of a public office. A mere allotment of petrol-pumps or shops in building complexes, are said to have minted money with no capital, and no risk either. Money can also be minted from payment of bills for medical instruments that were never delivered or of money for cooperative that were never sent, or from trees that were never planted. One needs only imagination to drag oneself from the dregs of a miserable existence, in poverty. From time to time an angust incorruptible judiciary misunderstand this noble mission and raise the roof (did I hear anyone mention some Chief Justice Ramaswamy's being nearly impeached some time back ?) such noises are well-intentioned but misguided.

Education is yet another issue of consensus. In 1947 percentage of educated person was only 1 in 3. After 50 years of glorious independence, that ratio is now 1.3 or 1.4 in 3. But this is not because Indian politicians have neglated this issue. It is only that they have stressed on literacy, rather than on education, since the former is more important. Literacy can be early achieved by setting up a few spurious schools, letting loose do-gooders, and launching mass contact campaigns. More importantly such schools can be granted donations that would bring pleasant smiles on the faces of incorruptible officials. Also, in addition to statistical wizardry meant to impress the critically gullible voter of the government's achievements, genuine progress (if made) would make the name of the candidates at least legible when it appears on village wall, or ballot paper. Spread of literacy is thus more commendable then of education that makes one susceptible to criticisus of politicians made with malicious intent.

National defence is the other issue of consensus, and rightly so. India's foreign policy hasn't much that is suggestive of sovereignty. During the cold war it was a policy of "nonalignment (with the U.S.A)". Since the end of cold war and increasing tendency toward globalisation that policy has lost its relevance. Now, the policy hinges on a virulent nationalism, harping on national defence. That is supposedly threatened by a neighbouring state (the anonymous "dushman" of Hindi films) So with unpleasant memories as of the Befors relegated to oblivion, Indians became Indians all over again by delighting over Prithvi and other missiles. Of course, we were surprised when malicious analysts abroad told us such missiles could easily carry nuclear warheads. Of course it was false we Indians do not have a nuclear arsenal. If anything we are opposed to any such arsenal. But that doesn't mean

we can be tricked into signing forces like the NPT or CTBT. We will do so only when those who do have it now dismantle their arsenal— so that we can all start from scratch if the consensus on CTBT breaks, down. Until then we won't foreclose our options. We may or may not have a coherent nuclear policy, but if we don't at least pretend to have one, our sovereignty might be held suspect, particularly in light of present allegations of throwing in the towel before GATT or the MNCs.

The strength of India's democracy lies in her democratic traditions. Indian democracy, it is said, is different from its western prototype ompe so. India's pre-muslim history show that self-government was a principle ingrained in the subcontinen— and the Panchayati Raj has been drawn from those days of glorious past. Here Indian democracy is better than her western prototype because Indian politicians have fashioned it to meet the needs of this country, of children of the higher God. It is in defence of those improvised democratic traditions that we once had a National emergency, and almost always have citizens dying who come in the way of democracy on the polling day. Defenders of the democracy are early indentifiable. They are the once who frolic about the polling booths with boms and firearms on polling day. They are the ones who dance a jig on the ruins of a shrine of a faith they don't share. They are the ones who 'execute' people from a particular community after a premier is shot dead. They are the ones who make a street theatre activist breathe his last after being exposed by him; they are the ones who disrobe women be it in state legislatures on Panchayat Committees.

Salute Indian democracy! In such a divine political scenario, how can one even imagine of voter-apathy?

On Liberalism

Boriá Majumdar
First Year
History, Postgraduate Level

"Assuredly we entetain no doubt on this point; we hold that civilization is a good, that it is the cause much good, and is not incompatible with any; but we think there is other good, much even of the highest good, which civilization in this sense does not provide for, and some which it has a tendency (though it is a tendency that may be counteracted) to impede."— J.S. Mill. *Civilization.*

"Human society is always by its very essence to the extreme that it is a society in the measure that it is aristocratic, and ceases to be such when it ceases to be aristocratic."[1]

"For the rebellion of the masses is one and the same thing with what Rathenau called the vertical invasion of the barbarians.' It is of great improtance, then, to understand thoroughly this mass man with high potentialities of the greatest good and the greatest evil."— Jose Ortega y Gasset. *The Revolt of the Masses*[2]

The 'rise of the masses' from the late seventeenth century onwards has been a matter of grave political concern to political theorists. On the one hand these has been the fear of homogenization and mediocrity that invariably accompanied the rise of mass society, and its corresponding dilution of the quality of political and cultural life; on the other the rise of the masses has been hailed as a symbol of redemption and hope.[3] It is

1. Jose Orgega y Gasset *The Revolt of the Masses.* p. 20
2 Ibid p. 53
3. The French revolution and the industrial revolution, to mention just two events in European history gave a tremendous filip to, and even celebrated the rise of the masses.

on account of a combination of both there concerns, that massification raises some very important questions pertaining to the theoretical foundations of liberal political thought. It has been noted by political theorists that liberalism while priding itself on its universality and politically inclusionary character has in practice been marked by the systematic and rational exclusion of various groups and types of peoples.[4] This raises certain fundamental questions about liberalism's commitment to the ideals of freedom, universal suffrage and finally democratic political institutions. Through a close reading of J.S.Mill's essay on *Civilization* and Ortega Y Gasset's *Revolt of the Masses* I want to explore the implications of the problems preceived by these theorists upon the rise of mass society. The rationale for such a reading is that, while traditionally the liberal project was posited on the participation of the masses, yet the so called rebellion of the masses was regarded as a threat to liberal practice and theory. This inturn will lead to an elaboration on the project of liberalism, as understood by John Stuart Mill, especially his notion that liberalism was based fundamentally on the notion of progress. As for Ortega y Gasset, I want to relate his ideas to the liberal project designated by certain theorists as 'voluntarism'. The latter implied a strong commitment to individualism and plurality and an opposition to "a life encompassing ideal that is for everyone harnessed to the conviction that its requirements can and should be imposed on everyone by political, religious or other kinds of authority and power. Transvaluations and transformations are indeed sought, but this is and must be the work of individuals."[5] I hope that it will be clear by the end of this paper that liberalism is a specific ideology dependent on notions of progress and improvement even if these ideas get played out, as they often do in terms of civilizational hierachy, political exclusion etc. Thus Liberlism I want to argue is not about notions of some universal understanding of what it means to be human. But inherent in liberal thought is a philosophy that helps us conceptualize the universal in such a way that it does not become the same for everybody.

II

In his essay, *Civilization,* Mill defines civilization in terms of a contrast. The expression civilization he argues can be interpreted in two ways. Firstly in terms of human perfection i. e. using qualities such as happiness, wisdom and nobility of character as indices to civilization. The other means to determine the scale of civilization was on the basis of a society's wealth and population, the absence of which (in large scales), would make a society savage and barbarous. It is the second definition that Mill privileges in this essay. The dichotomy between civilized and uncivilized societies understood in the manner outlined above is central to this work. It is noteworthy that the distinction between civilized and uncivilized societies does not correspond to what is morally commendable. Rather, "Whatever be the characteristics of savage life, the contrary of these, or rather the qualities which society puts on as it throws off these constitute civilization."[6] Thus for Mill the ability of a society to settle down on a large tract of territory, to organize commerce and agriculture on that land to sustain life, to act in concert for the achievement of some common end, to establish the concept of private property,

4. See Uday Mehta, 'Liberal Strategies of Exclusion". P. 427. Politics & Society.
5. Richard. e. Flathman, Willful Liberalism, p. 12. Voluntarism as elaborated in this book is wedded to notions such as singularity and innovation, unintelligibility and mystery, will and willfulness. The thinkers who Flathman classes as liberals here include the likes of Hobbes, Nietzsche, William James etc. I use this idea because Ortegy Y gasset's opinions on massification in the Revolt are in my opinion a pale reflection of Nietzchean thought seen through liberal eyes.
6. John Stuart Mill. Civilization p. 46.

institution of political and juridical machinery to safeguard that poperty, and the maintenance of peace and security in society are the hallmarks of civilization. In sharp contrast to these qualities, in savage societies the concept of cooperation is virtually nonexistent; there is no law or administration of justice and no recognized authority to pevent the bodily harm of an individual and his property by another. He carries these characterizations of civilization a step forward when he argues (rather critically and with a degree of concern) that, in civilized societies power passes from individuals to the masses and thus there is an erosion in the significance of the individual. This has its inpact on two arenas of life— the ownership of property and intellectual enrichment. Which in earlier times property was contentrated in the hands of a few, civilizational progress witnessed the wide diffusion of property among the middle calsses. The purchasing power of the laboring classes also increased. The overall, result was a reduction in the significance and power of individual property rights. Furthemore while the expansion of collective property in indicative of the increase of the national product and income it also means that none of the individual property owners would be able to survive alone, on the strength of their individual fortunes. The fragility of the individual is further stressed when Mill speaks of the state of knowledge and intelligence in a civilized society. While the rise of the masses initially saw a decline in bigotry and other prominent evils of aristocratic society, once the obvious victory of mass society became indisputably established there was no innovation of new and vigorous social institutions To put it in Mill's own words, "With all the advantages of this age, its facilities for mental cultivation, the incitements and the rewards which it holds out to exalted talents, there can scarcely be pointed out in the European annals any stirring times, which have brought so little that is distinguished, either morally or intellectually to the surface- ...even if civilization did nothing to lower the eminencies, it would produce an exactly similar effect by raising the plains."[7] In such a society the key to success lies in the skills of people to market themselves, and in their powers of presuasion. He takes the specific instance of the state of literature and pedagogy in a 'civilized' state, and bemoans the lack of quality which is the unavoidable by product of mass production of scholarship.

Thus the rise of mass society, which brings in its wake collective conformity, and the resultant leveling out of individuality in all spheres of life is baneful for Mill. Such a society is ultimately not conducive to the effloreesence of the principle of liberty, sicne its becomes impossible for individuals to exercise informed preferences, which is the only means of increasing the aggregate utility in the society. Hence it will be a mistake to assume that Mill champions individual freedom in some abstract sense. He sees the latter as the most important means to maximize utility and facilitate progress. It is perhaps for this reason that Mill's description of the savage in this essay is tinged with admiration. The savage while incapable of determining the significance of higher quality pleasures is nonetheless heroic by virtue of his bodily strength, courage and enterprise. He "cannot bear of sacrifice, for any purpose his individual will, for a common purpose."[8] This factor in its turn is responsible for the backwardness of savage societies (or any other society like India that formed part

7. ibid p. 52
8. Ibid p.48

of the Empire). Voluntary cooperation is essential for the rise and growth of civilization, which most backward societies regard as a mark of compromise.

What Mill appears to be advocating in this essay is an ordered anarchy, contained eccentricity. He presumes that anarchy may be contained under the guidance of competent judges (the universities, the church), who are the energizers in democratic societies. Thus for Mill the principle of liberty is essential for the mental development and civilizational progress of human beings. In the case of civilized nations in Europe, particularly Britain, the duty of the constitutional leaders lay in making the masses wiser and in arousing the 'slumbering energy' of the opulent and lettered classes. The situation was different however for countries lower down in the civilizational hierachy. There are clearer resonances of these ideas in This other writings praticularly when he writes about countries and peoples under the sway of the British Empire and attempts to justify that subjugation— "The ruling country ought to be able to do for its subjects all that could be done by a succession of absolute monarchs, guaranteed by irresistible force against the precariousness of tenure attendant on barbarous despotisms, and qualifies by their genius to anticipate all that experience has taught to the more advanced nation."[9] For backward societies therefore there can only be a 'choice of despotisms' and the principles of liberty i.e. democratic representation and suffrage do not apply. For Mill then colonized counties could be divided into two classes: the first group included those states "of similar civilization to ruling country: capable of and ripe for representative government: such as the British possessions in America and Australia."[10] Others like India "are still at a great distance from that state."[11]

It is justified to ask at this point the exclusion of certain societies (and I am referring specifically to the second group of states mentioned earlier in the British empire) from participation in representative political institutions was a violation of the theoretical tenets of liberalism. For theorists like Mill the universality of liberal theory was premised on the assumption of a constant- human nature, and this was determined at the moment of the birth of the political subject. Hence all the qualities (being equal, free and rational) upon which political inclusion was made possible were in fact actualized in the subject even before he attained the age for political maturity, simply by virtue of birth and possessing certain cultural preconditions. What made it possible for liberal theorists like Mill to exclude certain peoples (eg. India) from participation in liberal political institutions were certain historical particulars. India was temporally situated on a civilizational hierarchy that demonstated the fact that, Indians were in a state of civilizational hierarchy that demonstrated the fact that, indians were in a state of civilizational infantilism, and were epistemologically obdurate. This was facilitated by a systematic construction of British knowledge systems about India, of Indian archaeology, numismatics etc. all of which pointed to the fact that while Indians had a society, they had no state in their long history. It was then possible to place India on a evolutionalry map and argue then, that the state of Indian society was much like that of Great Britain's several centuries ago. Once this was established it was no longer difficult to

9. J. S. Mill, "On Liberty", in *Three Essays*. p. 409
10 Mill, "Representative Government", p. 402
11. ibid

exclude Indians from participation in liberal political institutions. Whether or not there was sufficient historical evidence for these clains is not the crucial issue here, it is however importnat to note that although anti-colonial in its essence, for Mill, the project of liberalism was not to transport Britain to India, but rather to spur the progress of the Indian people. Thus for Mill there was no inherent contradiction between liberalism and Empire. The latter was not an abstract entity. Caught in the middle of history, the Empire was a moment of agitation, an agitation premised on the larger idea of progress. This notion of civilizational infantilism and epistemological obduracy was not limited to the Empire alone and had wider applications. It also found instantiation in various other groups within the civilized countries e.g. the English working classes and others referred to earlier the masses, and hence their exclusion from the liberal project.

III

Ortegy y Gasset's book *The Revolt of the Masses* opens by conjuring a spectacle of plenitude that had come to characterize European life since the late nineteenth century. This plenitude in his opinion was symbolic of 'the accession of the masses to complete social power."[12] This is turn was symptomatic of a grave crisis in European society since, "the masses by definition, neither should nor can direct their own existene, and still less rule society in general".[13] and thus their accession to power in the state was the mark of deep political and social stagnation. He then goes on to make certain important distinctions between the individual, the minority and the social mass. True, the mass was made up of individuals, but the latter existed in the multitude not as individuals but as an agglomeration. And it was this multitude that has "suddenly become visible, installing itself in the preferential positions in society... it has advanced to the footlights and is the principal character there are no longer protagonists ; there is only the chorus."[14] The masses are also distinct from the minorities. The latter were "individuals or groups of individuals which are specially qualified."[15] The mass on the contrary was "the assemblage of persons not specially qualified."[16] the principal constituent of the mass was the 'average man', undifferentiated from other men. Some special characteristic, some eccentricity characterized the man in the minority, and the fact that they cooperated to form the minority was secondary to their nurturing their singularity. A minority was in a sense a 'limited public.' The mass on the other hand is a psychological fact. As Ortega Y Gasset argued it "is all that sets no value on itself-good or ill-based on specific grounds, but which feels itself 'just like everybody' and nevertheless in not concerned about, is in fact, quite happy to feel itself as one with everybody else."[17] It would be a mistake to resume that the division between masses and minorities was a class based one. In fact there existed in all classes elements that were 'mass' and 'select'. Thus for Ortega y Gasset the idea of 'mass' and 'average' was an ontological rather than a statistical category.

What are the characteristics of the mass man and why does he pose a threat to civil society, despite being one of its prime constituents ? The mass man or the 'new Adam' stood apart from men of earlier generations by the innate hermetism of his soul and intellect. His medio-

12. Ortega y Gasset, *The Revolt of the Masses*. p. 11
13. Ibid
14. Ibid p. 13
15. Ibid
16. Ibid
17. Ibid p. 14 15

crity precluded self-interrogation or comparison of himself with persons outside the herd. This is not to say that this man was a 'fool'. Rather his capacity for cleverness was of "no use to him; in reality the vague feeling that he possesses it seems only to shut him up more within himself and keep him from using it."[18] Thus the present age was one that celebrated the state of its being vulgar and mediocre and made these considerstions a way of public life. But the danger lay in the fact that this vulgarity had come to dominate aspects of public life hitherto untouched by it-the political, literary and social.

This last was on account of the fact that in earlier periods of European history the mass never prided itself on possessing and articulating ideas and theories. This inability came from a judicious recognition of its own limitations. Consequently these responsibilities were delegated to individuals specially qualified and able to carry them out. It may be rightly argued here that the assumption of greater responsibilities by the average should be interpreted as a sign of progress. But such a claim cannot be substantiated since "the ideas of the average man are not genuine ideas, nor is their possession culture." Genuine ideas with a claim to higher truths cannot be in the realm of possibility without the acceptance of a higher authority which judges them against certain given standards upon which a culture rests. And there can be no culture without custodians (theoretical) of legality, economics and aesthetics to appeal to. To summarize then in Ortega y Gasset's opinion what distinguishes mass society from preceding eras was its lack of 'civilization'. "Restrictions, standards, courtesy, indirect methods, justice, reason"-these are the hallmarks of civilization and their absence a symbol of barbarity.

Etymologically the word civilization can be traced to *civis* or citizen and is dependent on certain notions of community life, "a will to live in common."[19] Barbarism on the other hand is divorced from any tendencies towards association. And the political ideal that translates the urge of human beings for a civilized life is liberal democracy. Liberalism is the political principle "according to which public authority, inspite of being all powerful, limits itself and attempts, even at its own expense, to leave room in the state over which it rules for those to live who neither thind nor feel it as it does, that is to say as do the stronger, the majority."[20] But having conceded that it was a political principle based on generosity and nobility in the it took into account the co existence of the majority with the minority, Ortega y Gasset labels Liberalism as "anti natural." Liberlism in his opinion "is a discipline too difficult and complex to take firm root on earth."[21] This is proved by the politics of Europe in the 1930s when liberalism was swept aside by the tide of Syndicalism and Rascism which were forms of "direct action" by the masses. These political movements were constituted by a man, "who does not want to give resons or to be right, but simply shows himself resolved to impose his opinions." Arising from the intellectual hermetism of the masses, these movemmets were a manifestation of their decision to rule society without having the capacity to do so.

The present age therefore, is an age of hyperdemocracy, in which the masses act directly, "outside the law"[22]. The implication

18. Ibid p. 70
19. Ibid p. 76
20. Ibid
21. Ibid
22. Ibid p. 17

was not that they were tired of politics and had handed the strictly political responsibilities to persons qualified for the task. In the condition of hyperdemocracy the masses believe in their 'right' to impose their will on the government of the country. "The characteristic of the hour is that the commonplace mind, knowing itself to be commonplace, has the assurance to proclaim the rights of the commonplace and to impose them wherever it will."[23] This rise of the 'historic level' brought about by the literal mobilization of the nation cuts into the idea of interests and places the liveral state in crisis. The idea of human rights which got substance within of the liberal nation state are undermined and minorities no longer flourish. Such mobilisation and massification implies that the old contractual relations no longer apply and substantive will becomes *de rigeur* in the state.

IV

For both Mill and Ortega y Gasset civilization and liberalism are deeply linked phenomena. And broadly speaking both percieved the rise of the masses as a threat to civilization and concomitantly to liberalism. However the preceding statement requires certain qualifications, for although the two theorists are spurred by the basic motivation to safeguard progress in civil society through the mechanism of liberal institutions, their understanding of 'liberalism' as a phenomenon is at variance. Mill's yardstick for classifying societies as civilized and savage was based on the differences in people's cultures, social development and race. Thus for Mill representative government, the hallmark of liberalism was premised upon a specific developmental trajectory. Barbarians and savages had to be kept outside the bounds of liberal political institutions until they were trained to participate in them. Even in a civilized society, like nineteeth century England he defended the existence of hierarchies to that the political life, culture and the arts would not come to be dominated by the mediocre man. Hence for Mill the political exclusion of certain peoples from participation in liberal government was a funtion of the particulars in which their life was embedded. Their backwardness, was the tool that put them on an evolutionary path and helped compare their present state to that of civilized peoples several centuries ago. For Mill *human nature* was a constant he deployed for advocating an exclusionary liberalism. Ortega y Gasset's take on liberalism is more abstract. It has Nietzschean underpinnings in that it is based upon the belief that there can be no 'common good'. Thus while mill advocated the same developmental path for all peoples, for Ortega y Gasset that which is common cannot have much value if it is inflicted and imposed on individuals who consider it alien. These conceptions (the notion of common good) may have contributed to the 'preparatory' work that was needed for the foundation of a civilized society. But as ideals they are to be rejected by the Nietzschean brand of "willful liberalism."[24] The word willfulness is here used in a deeply idealistic sense.As Richard Flathman has recently argued, any conception of liberalism must privilege the capacity of human beings for self command or self control. These qualities in his opinion are engendered by public life, failing which society resorts to quintessentially illiberal institutions like the prison, asylums etc. But it also true that public life at its best cannot create or sustain individuality and (as Ortega y Gasset

23. Ibid p. 18
24. Richard Flathman, Willful Liberalism

has shown) can even destroy it. In ideological terms such a foumulation shows the futility of the attempt to achieve individuality by emthods of government. Self control, moderation, magnanimity and other qualities which in Ortega y Gassets opinion characterise liberalism are elements in all strong voluntarist conceptions of individuality. Without them individuality deteriorates into here behavior and self indulgence. But having said this is it crucial to keep in mid the fact that, "neither these nor many other elements comprise or constitute individuality or free spiritedness...the free spirit goes beyond the self discipline that prevents harmful or destructive conduct and forms and cts upon images and objectivies that complicate and endanger, amplify, heighten, and intensify her life... Willful individuality cannot be caputred, certainly not explained, in or by any formula."[25] It is in this sense that I wanted to align Ortega y Gasset's thoughts to the voluntarist tradition of liberal political throught. He appears to be upholding the Nietzschean dictum "For it needs many nobles and many different kinds of nobles to make nobility... Or ...Isn't the most divine thing of all that there are gods but no god."[26] Although a liberal state is most conductive to the nurtuance of such individuality, the latter can exist in any state formation. And it is this kind of individuality that I hinted at earlier in this paper that can only *truely* exist in the realm of ideals. It is possible to theorize about such an individuality as being the prime component of liberal political thought, but only by first acknowledging that it is an universal that *cannot* be the same ofr everbody.

Since the main purpose of this paper was to talk about liberalism as a principle of the political philosophy, it does not suffice to talk about it on the realm of ideals aone. Liberalism, as I understand it is also a viable political principle which, as evinced by both the theorists discussed earlier has been threatened by the rise ofthe masses. In by concluding sections therefore I want to explore this apparently anomalous situation- why the masses are a threat to liberalism in practice when their participation was crucial for the success of liberal institutions to being with?

I think the main problem lies in liberalism's (or to be more specific Parliamentarism which is the most important institutional heritage of liberalism) identification with modern mass democracy. Democracy rests on a principle of homogeneity and the eradication of heterogeneity. The question of equality in a democracy, "is precisely not one of abstract, logical arithmetical games. It is about the substance of quality' , because "equality is intresting and valuable politically so long as it has substance, and for that reason at least the possibility of inequality."[27] Thus the British empire or the Athenian city state never ceased to be a democracy although all the inhabitants within their territorial jurisdiction were never politically equal. Universal suffrage, equal rights- all make sense within the given structures of substantial equality. Any equality that does not accomodate certain inequalities is an 'indifferent equality, actually takes hold of an area of human life. then this area loses its substance and is overshadowed by another sphere in which inequality then comes into play with ruthless power."[28] This idea of inequality in

25. Ibid p. 211-212
26. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, pt 3 sec 11, p. 239. I have relied greatly upon Flathman's analysis of Nietzsche as a volutarist in my analysis of the revolt.
27. Carl Schmitt, *The Crisis of Parliamentary Democracy*, Preface to the second edition, 'On the contadition between Parliamentarism and Democracy' p. 9
28. Ibid p. 13

state formations can be traced back to the contract theorists. For instance, Rousseau's general will demonstrates that the state can exist only when the people are so homogeneous that there is no conflict in interests. In fact when Rousseau spoke of the slave he menat all those who did not belong to the people, e.g. the alien, who despite being a 'person' could not participate in the politics of the homogeneous. Thus in a democracy there cannot be enforced homogeneity, via a contract.

"The idea of a free contract of all with all comes from a completely different in theoretical world where opposing interests, differences and egoisms are assumed. It comes form libralism." The crisis of liberalism due to the rise of the masses is thus a crisis of praliamentarism in a mass democracy. Throughout the nineteenth century the two principles advanced together in therir common crusade against aristrocratic and monarchical institutions. But once the common enemy was out of the way the difference between the two principles liberalism and democracy, manifested itself strongly. The basis of Parliamentarism rests on its defense of the principle of free and open discussion, discussion being understood as "an exchange of opinion that is governed by the purpose of persuading one's opponent through argument of the truth or justice of something, or allowing oneself to be persuaded of something as true and just...To discussion belong share convictions as premises, the willingness to be persuaded, independence of party ties, freedom from selfish interests."[29] Thus discussion in Parliament is not simply negotiation. But the rise of mass democracy has put this principle of argumentative public discussion into jeopardy. With the rise of the masses reduced the rules of parliamentarism, such as openness of sessions, independence of representatives have been reduced to mere formalities. The political parties, conduct themselves more in the manner of mutually contending economic and social power blocs and the masses are won over by slick propaganda machinery. As Carl Schmitt remarks. "it is no longer a question of persuading one's opponent of the truth or justice of an opinion but rather on winning a majority in order to govern it."[30] Thus Parliament in its present form has been reduced to an "instrument of social and political technique". But as Schmitt rightly argues that if this is the only justification for the existence of parliament then it only has to be shown that the same functions could be performed by other types of political institutions and that would spell the end of parliamentary institutions.

The rise of the masses therefore leads first to a crisis in the modern state. This crisis is one of both democracy and liberalism. The crisis is symptomatic of a contradiction between liberal individualism and the political ideas of mass democracy.

29. p. 5
30. Ibid p. 7

God— and why I Believe in Him: A Western Perspective

Projit Bihari Mukharji
Second Year
Philosophy Honours

The qualitative difference between man and man that Nietzsche used to deny the existence of God is in fact the very basis of it. The idea of God though present since pre-history has only been systematized and should we say 'logified' in the post-Renaissance period.

The first to undertake this task were the Cartesian rationalists. Seeing the qualitatively differential reality of individuals they reasoned that there exists an individual in whom all the different qualities, only partialy present in individuals, would be presant to the maximam. In fact Descartes had, by this, accepted the age old ontological argument, first advanced by St. Anselm. Gottfried Wochelm leibniz strengthened this further by defining perfection as a conglomeration of 'positive absolutes expressed unlimitedly,' and funther by showing that no two perfections could be contradictory. Hence he reasoned that 'existence' being a positive absolute must precede 'non-existence'. During the formulation of this final form of the argument, though quite inacluentently, a definite shift had been admitted into the western idea of God. From a Spinozistico-Cartesian conception of God being a metaphysical scapegoat it had transmutated into an all powerful Super-human much akin to Nietzsche's 'noble man', or the 'antistic tyrant'. It was the image of a supremely

powerful classical hero, a.k. a superman.

Immanuel Kant countered this by showing that an imaginary hundred dollar bill and a real one may both be described without raising any question of existence whatsoever. He reasoned that existence wasn't a predicative imperative at all. The objection to this is twofold. Primarily that to describe a hundred doller bill, even if it be an imaginany one, it is a pre-necessity for us to have seen it at least once. Therefore even if God is not an intuitive certainty, it is quite definitely an a priori judgemental one. Seceodly, an analytic proposition, which according to Kant himself is always time, is one where all the possible predicative terms contribute to the notion of the subject term. Now by Bertrand Russell's theory of description, a finite human mind is simply unable to comprehend a non-existential entity, hence the very comprehension of God is subservient to the prior notion of His existence.

Next in line came the Cosmological argument. This potrayed God as the *humeno uno* in a causal sequence. Again Leibniz modified this syllogism in keeping with his theory of sufficient reason. His contention was that since no apparent reason for the real existence of this world was to be found in it, it must lie outside its pueeinets.

The major refutations to this arose from David Hume's denial of causality in the first place. Hume had argued that causality was in its quiddity, and quintessentially all that was emplically pencieued was a constant conjunction of two enents, say A and B. further he clamed the proposition 'A and B' was logically untenable. Now modern science has proved beyond sufficient doubt that matter/energy can neither be destroyed nor created, only mutated— law of conservation of energy and Schrodinger's energy matter duality. The ancient Latim addage "Ex nihilo nihil fit." (Nothing comes out of nothing) hence stands irrevocably proven. Hence the causal proposition now dakes the form "All A is B", which of course is a logically valid universal affirmation. Though the question that may then arise is that if, as Kant holds, time and space one subjective phenomenon, how do we decide whether A causes B or B causes A. Here again as Russell proves, out even if they and subjective phenomena (though this view itself has now been sucessfully repudiated, but the arguments are too voluminous and mother diguesive for the purpose of this autide.) the subjective spatio-temporal arrangements must follow a natural law. Consequently the perceptible precedence constant conjunction and coulaiment together substantiates the causal neatily and thereby the cosmological angement too.

The so called 'eternal truths' argument of Leibniz is another pillar of the castle of God. Ideas ave objects of the mind. Now some ideas are eternally true, i.e. 'Blue is not Red'. They must consequently flow from an eternal mind. This was the gist of his contention. Though seemingly simplistic its raison d'etre lay embedded in the theory in favour of innate ideas. It is in fact a normative derivation of Plato's derivation of immortality.

John Locke's stand point that all knowledge was conscious and hence emperical, thereby defeating the innate ideas is effectively repudiated by Leibniz in his New Essays on Human Understanding Leibniz showed us that by conceding 'memory' Locke had already allowed the central theme of 'innate ideas'. Locke counters that when we recollect we remember the situations in which it was acquired as well. This is rather feeble argument. For the memory of acquisition is nothing but a set of spatio-temporal connotations, and the inniate ideas are by definition received in the 'soul's first being', thereby it preceds spatio-temporality itself. Another objection to this has often

been that can a non-conscious knowledge be dubbed 'knowledge' at all. This is almost exactly the objection put forward by the detractors of Noam Chomsky's Theory of Syntax. Hence his answer should satisly us. He contended that call it 'Knowledge' or whatever else it remained an innate data bank that is elucidated, ordered and categorised by experience.

Finally there's the natural harmony argument. Everyday experience makes it diffcult if not impossible to maintain that the well planned out running of the world is indeed attributive to blind natural force alone. This is arguably the most widely believed evidence of God, but this again significantly modifies the notion of God. As Kant had put, it reduces God from a Creator to a mere Architect. From the "all powerful" he becomes 'very powerful.'

Apart from these main reasons others like Rousseau, Hegal, Kant etc. have chosen to prove God through their own metaphysical tenets, but these act more as a epistemo-metaphysical patchwork to corroborate the more difficult aspects of their philosophies rather than as an integeal part of it. God to me and I believe to those blessed with reason and curiosity is more than a philosophical superman. Be he the Creator on the Anchitect—he is. To go back to our old friend Nietzsche the rambling aruistocrat God may be dead but death presupposes life and as we all know history repeats itself, so I contend not only that God is alive but also that will live. Amen.

The Burgess Shale Fauna

Rhitoban Ray Choudhury
Second Year
Zoology Honours

This is the story of one of the most important fossil sites of the world— the Burgess Shale of British Columbia, and the treasure trove that lied dormant within it. But more importantly this is a chronicle of the interpretation of that biological treasure and the resultant discourses acquired by us about our own place in the history of life on Earth.

Charles Doolittle Walcott, premier palaeontologist and secretary of the Smithsonian Institution (their name for boss) and perhaps the most powerful administrator of American sciences found this oldest fauna of wonderfully preserved soft-bodied animals in 1909. But his traditionalist viewpoint failed to grasp the uniqueness of these animals, and perhaps, unfortunately, rendered these animals invisible to public notice (though they Surpass the dinosaurs in their potential for information and insight about life's history). But fifty years later three men— Harry Whittington of Cambridge University, the world's greatest expert on trilobites, and two graduate students who built up brilliant careers upon their work on the burgess fossils, Derek Briggs and Simon Conway Morris— meticulously described the true anatomical details of the Burgess Shale animals. They began their work without even the

faintest notion of their radical and far-reaching potential. Their re-interpretation has not only reversed Walcott's original inferences, but has also confronted our traditional view about progress and predictability in the history of life with the historian's challenge of contingency- the 'pageant' of evolution as a staggeringly improbable series of events utterly unpredicatable and quite unrepeatable. Wind back the tape of life to the early days of the Burgess Shale; let it play again from an identical starting point, and the chance becomes vanishingly small that anything like human intelligence would grace the replay. But even more fascinating than our re-interpretion are the Burgess organisms themselves : *Opabinia*, with its five eyes and frontal 'nozzle'; *Anomalocaris*, the largest animal of its time, a fearsome predator with circular jaws ; *Hallucigenia*, with an anatomy to match its name.

I. The Age of the Burgess Shale:

The Burgess Shale dates back to the Cambrian times (about 570 million years ago). The Cambrian period is marked by the 'Cambrian Explosion' or the first appearance of multicellular animals with hard parts in fossil records. The Burgess fauna does not lie within the explosion itself, but marks a time soon afterwards, about 530 million years ago. As the only major soft-bodied fauna from this primordial time, the Burgess shale provides our sole vista upon the inception of modern life in all its fullness and is our only glimpse to this pivotal moment in the history of life.

II The mode of Preservation:

Most of the specimens were obtained from a lens of shale only seven or eight feet thick covering about two hundred feet of outcrop. And to think that one small quarry in British Columbia, little taller than a man and not so long as a city block, housed more anatomical diversity than all the world's Sea today ! How could such richness accumulate in such a tiny place ?

Recent investigations have thrown some light on the geology of this area and have offered a plausible explanation (Mc Ilreath and Aiten, 1984 ; Whittington, 1985b). The Burgess animals probably lived on mud banks built up along the base of a massive, nearly vertical wall, called the Cathedral Escarpment a reef constructed prmarily by calcareous algae (reef-forming corals were yet to evolve). Such habitats in moderately shallow waters, adequately lit and well- aerated, generally harbour typical marine founa of high diversity (and the Burgess shale too holds an ordinary fauna from habitats well represented in the fossil records) But herein lies the paradox. Good lighting and aeration may encourage high diversity but also acceleratesrapid scavenging and decay. So for the organisms to be preserved as soft bodied fossils they had to be moved elsewhere. Perhaps the mud-banks heaped against the walls of escarpment became thick and unstable. Small earth movements must have sel-off turbidity currents propelling clouds of mud (containing the Burgess organisms) down slope into lower adjacent basins that were stagmant and devoid of oxygen. This explanation fulfils the most important criterion movement of a fauna from an environment where soft anatomy could not be preserved to a region where repid burial in oxygen free surroundings could occur. The pinpoint distribution of the Burgess fossils supports the idea that they their preservation to local mud slides. Other features of the fossils also lead to the same conclusion: very few specimens show signs of decay implaying rapid burial; no tracks, trails or other marks of organic activity have been found in the Burgess beds, thus indicating that the animals died and were overwhel ned by mud as they reached their

final resting place. Since, more often than not, Nature tramples on our hopes let us be thankful for this rare concatenation of circumstances one that has enabled us to wrest of great secret from an otherwise uncooperative fossil record.

THE BURGESS ORGANISMS

The reconstruction of the Burgess shale organisms was first published in a series of long and highly technical taxonomic and anatomical monographs in the *Philosophical Transactions of the Royal Society*, London the oldest scientific journal in English (dating back to the 1660s). Only few of the burgess organisms are described here.

(1) **Wiwaxia**=

[The name is derived from the local Indian word *'Wiwaxy'* meaning 'windy']

Life so many Burgess organisms, *Wiwaxia* is an anatomy unto itself. It is a small creature, shaped as a flattened oval (rather libe a well rounded pebble), about an inch long, on average, with a two-inch moximum. The simple body is covered with plates and spines called sclerites except for the naked ventral surface that rested on the substrate as *wiwaxia* crawled across the sea floor. Two rows of seven to eleven elongate spines arise from the upper row of sclerite on each side, hear the border with the plates of the top surface. The spines project upward and presumably acted as protection against predators.

(2) **Anomalocaris**

[The name means 'odd shrimp']

Whittington and Briggs published their monograph on *Anonalocris* in 1985, a fitting triumph to cap what may be the most distinguished twentieth century palaeontology. The long oval head of *Anomalocaris* bears, on the side and rear portion of its dorsal surface, a large pair of eyes on short stalks. On the ventral surface, the pair of feeding appendages are attached (near the front) with the circle of the mouth behing and in the mid - line. The plates of the circlet could substantially constrict the area of the mouth but not fully come together, so the mouth probably renaimed permanently open, at least partially. Behind the mouth of the ventral surface, the head carries three pairs of strongly over lopping lobes. The trunk behing the head is divided into eleven lobes each tringular in basic shape, with the apex pointed back in the mid - line. The lobes are widest at the middle of the trunk, every tapering both in front and behind. These lobes, libe the three at the rear of the head, strongly overlap. The termination of the trunk is short and blunt, without any projecting spine or lobe. A multilayered structure of stacked lamellae, presumably gill, attaches to the top surface of each lobe. An *Anonalocaris* in motion may have resenbled a modern manta ray, undulating through the water by generating waves within the broad and continuous fin.

(3) **Opabinia**

The name is derived from the local Indian name *'Opabin'* meaning 'windy']

Whittington's reconstruction of *Opabinia* led to an animal that might grace the sel of a science fiction film if considerably enlarged beyond its actual length of three inches.

Opabinia does not have two eyes, but count'em, five! It has a froxtal nozzle which is a flenible organ, built as a cylindrical, striated tube. Its end is divided longitudinally into two halves, each with a group of long spines directed inword and forward. The main portion of the trunk has fifteen segments, each segment bearing a thin lateral lobe, one on each side of the centrl axis. These lobes overlap and are directed downward and

outward. Each lobe, except the first, bears on its dorsal surface a paddle-shaped gill attached near the base of the lobe. Although the bottom surface of the gill is flat, the upper surface consists of a set of thin lamellae overlapping kibe a deck of cards spread out. The fast three segments of the trunk form a 'tail' built by three pairs of this, lobate blades directed upward and outward.

(4) **Hallucigenia**

We need symbols to represent a diversity that we cannot fully carry in our heads. If one creature must be selected to bear the message of the burgess shale- the stunning disparity and uniqueness of anatomy generated so early and so quickly in the history of multicellular life - the overwhelming choice among conuoisseurs would surely be *Hallucigenia*. Simon Conway Rorris chose this most unusual and truly lovely designation to honour 'the bigarre and dream like appearance of the animal' (Morris, 1977)

How can you describe an animal when you don't even know which side is up, which end front and which back ? *Hallucigenia* is bilaterally symmetrical and carries a set of repeated structures in common with the standard design of many phyla. In broad outline, *Hallucigenia* has a bulbuous 'head' on one end, poorly preserved in all available specimens (about thirty) and therefore not well resolved. This 'head' attaches to a long, narrow, basically cylindrical trunk. Seven pairs of sharply pointed spines connect to the sides of the trunk, near the bottom surface, and extend downward to form a series of struts. Along extend downward to form a series of struts. Anong the dorsal mid-line of the body, directly opposite the spines, seven tentacles with two pronged tips extend upwards. A cluster of six much shorter dorsal tentacles (perhaps arranged. as three pairs) lies just behing the main row of seven. The posterior end of the trunk then narrow into a tube and bends upward and forward.

(5) **Pikaia**

[Walcott named this species as *pikaia gracilens* a honour the near by Mt. Pika]

Walcott thought that *Pikaia* was an annelid worm, But morris realized that it was a chordate, a member of our own phylum - in fact, the first recorded member characteristic jigzag bend of chordate myotomes, or bands of mussle. Furthermore, *Pikaia* has a notochord, the stiffened dorsal rod that vies our phylum, chordata, its name. In many respects *Pikaia* resembles, at beast in genearal level of organization, the living *amphioxus* long used in laboratories and lecture roons as a model for the 'primitive' organization of prevertebrate chordates.

In short, Harry Wittington and his colleagues have shown that most Burgess organisms donot belong to familar groups. Some fifteen to twenty Burgess species cannot be allied with any known group and should probably be classified as spearate phyla. For species that can be clasified within known phyla, Burgess anatomy for exceeds the modern range. It includes, for example, early representatives of all major kinds of arthropods, the dominant animals on earth today the trilobites (now extinct), the crusta ceans (including crabs and shrimps), the chelicerates (including spiders and scorpions), and the uniramians (including insects). But the Burgess shale also contains some twenty to thirty kinds of modern group. A brief summary of the organisms obtained and their phylogenetic status is given below.

Name	**Phylogenetic status**
Morrella	Unique arthropod.
Yohoia	,,
Burgessia	,,

Branchiocaris	Unique arthropod.
Odaraia	,,
Sidneyia	,,
Molaria	,,
Habelia	,,
Sortrocercus	,,
Actaeus	,,
Alalcomenaeus	,,
Emeraldella	,,
Leanchoilia	,,
Olenodes	trhilobite
Perspicaris	malacostracan (?)
Canadaspis	Malacostracan
Naraoia	soft-bodied trilobite
Tegopelte	,,
Sanctacaris	chelicerates arthroped.
Aysheaia	(?) Onchophoran or new phylum
Opabinia	,,
Nectocaris	,,
Odontogriphus	,,
Dinomischus	New phylum
Amiskwia	,,
Hallucigenic	,,
Wiwaxia	,,
Anomalocaris	,,
Canadia	Polychaete
Ottoia	Priapulid
Pikaia	Chordate

Burgess Shale and the Nature of History

The evolutionary theory is the paradigm for biologists. But our view of the process of evolution is warped because of our own parochial and narcissistic reasons. We view evolution to be a constant march of progress' — from the 'primitive' to the more 'advanced' stage. One of the classic examples is the often printed figure of human evolution. It shows man's constant march to become as he is now from our supposed ape like ancestors. The familiar iconographies of evolution are all directed sometimes crudely and sometimes subtly towards re-inforcing a comfortable view of human inevitability and superiority.The march of progress is the canonical representation of evolution the one picture immediately grasped and viscerally understood by all. Another iconography embedded in our conscience is the cone of diversity an upside down evolution In its conventional interpretation, the cone of diversity propagates an interesting conflation of meanings. The horizontal dimension shows diversity. But what does the vertical dimensions represent ? In a literal reading, up and down should record only younger and older in geological time: organisms at the neck of the funnel are ancient; those of the lip, recent. But we also read upward movement as simple to complex or primitive to advanced. Placement in time is conflated with judgement of worth.

Our ordinary discourse about animals follows from this iconography. Nature's theme is diversity. We live surrounded by coeval twigs of life's tree. In dorwin's world all (as survivors in a tough game) have some claim to equal status. Why, then, do we usually choose to construct a renking of implied worth (by assumed complexity, or relative nearness to human, for example) ? Life is a copiously branching bush, continually being extinct, not a ladder of predictable progress. Most people may know this as a phrase to be uttered, but not as a concept brought into the deep interior of understanding. Hence we continually make errors inspired by unconscious allegiance to the ladder of progress, even when we explicitly deny any such superanuated view of life.

It is highly improbable that any particular secret, mystery or inordinate subtlety underlies the reasons for our allegiance to these false iconographies of ladder and cone. They are adopted because they nurture our hopes for a universe of intrinsic meaning defined in our own terms. We simply cannot bear the

implications of Omar Khayyam's honesty:—
Into This universe, and why not knowing,
Nor whence, like water willy- nilly flowing;
And out of it, as wind along the waste
I know not whither, willy-nilly blowing.
Interestingly enough, as Freud observed, our relationship with science must be paradoxical because we are forced to pay an almost intolerable price for each major gain in knowledge and power— the psychological cost of progressive dethronement from the centre of things and increasing narginality in an uncaring universe. Thus physics and astronomy relegated our world to a corner of the cosmos, and biology shifted our status from a simulacrum of God to a naked, upright ape. No greater challenge to this iconography of the cone is known and hence no more important case for a fundamentally revised view of life than the radical reconstructions of burgess anatomy presented by Whittington and his colleagues. They have literally followed our most venerable metaphor for revolution: they have turned the traditional interpretation on its head. By recognizing so many unique anatomies in the Burgess, and by showing that familiar groups were then experimenting with designs so far beyond the modern range, they have inverted the cone. The sweep of anatomical veriety rearched a maximum right after the intial diversification of multicellular animals. The later history of life proceeded by elimination, not expansion. The current earth may hold more specimes than ever before, but, most are iterations upon a few basic anatomical designs. (Taxonomists have described more than a half million species of beetles but nearly all are minimally altered copies of a single ground plan). Compared, with the Burgess seas, today's oceans contain many more species based upon many fewer anatomical plans.

The history of life is a story of massive removal followed by differentiation within a few surviving stocks, not the conventional tale of stedily increasing excellence complexity and diversity.

Burgess Shale and Human Evolution:

Let us finally come to the question of all ages why do humans crist? A major part of the answer touching those aspects of the issue that science can treat at all, must be: because *Pikaia* survived the Burgess decimation. This response does not cite a single low of nature; it embodies no statement about predictable evolutionary pathways, no calculation of probabilities based on general rules of anatomy or ecology. The sourvival of *Pikai* was a contingency of 'just history'. We are the offsprings of history and must establish our own paths in this most diverse and interesting of conceivable universes one indifferent to our suffering, and therefore affering us maximum freedom to thrive, or to fail, in our own chosen way.

The last word on this subject is left to Mark Twain, who grasped so graphically, when the Eiffel Tower was the world's tallest building, the implications of geology's most frightening fact;

"Man has been here for 32000 years. That it took a hundred million years to prepare the world for him is proof that that is what it was done for. I suppose it is. I dunno If the Eiffel Tower were now representing the world's age, the skin of paint on the pinnacle knob at its summit would represent man's share of that age; and nobody would perceive that the skin was what the tower was built for. I reckon they would, I dunno."

প্রসঙ্গ সংস্কৃতি অথবা তোমারই রাজ্যে হে নৈরাজ্য!

শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ
ইতিহাস স্নাতকোত্তর

বছর দুই আগের কথা। ঋত্বিক ঘটকের জীবন ও নির্মাণ নিয়ে কলেজে একটি রেট্রোস্পেক্‌টিভ করার প্রস্তুতি চলছে। তারই জন্য অর্থের সংস্থান করতে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল প্রসিদ্ধ একটি বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার কাছে যারা নিয়মিত রেডিওতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রোমোট করে থাকে। আমাদের প্রকল্পের কথা শোনামাত্র তা থেকে আশু বাণিজ্যিক লাভের সম্ভাবনার আশায় উদ্বেলিত হয়ে একমুহূর্তে-রাজী-হয়ে-যাওয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি বলে ওঠেন, 'Well, he is now our product.' এই ব্যক্তিটির অপাপবিদ্ধ সারল্যকে প্রশ্ন করছি না যে কেন তিনি প্রথমেই ফস্ করে এমনটা ভেবে বসলেন, কেননা এ অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে নতুন ছিল না। আজ কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য লেখার বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল আর তাতে কাজটার সুবিধাও হল। সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণে কত মাইলেজ মিলবে তা দিয়েই যে 'কালচার ইণ্ডাস্ট্রি' অর্থাৎ গান, নাটক, সিনেমা, চিত্রশিল্প ইত্যাদিকে সম্বল করে বাজার অর্থনীতির নিয়মে চালিত শিল্পটি চলবে, সে বিষয়ে কম-বেশী পোক্ত অথবা ভাসাভাসা ধারণাটা আমরা কেউ কেউ হয়তো বুঝে উঠতেও পারি। মঞ্চে, গণমাধ্যমে পণ্যসংস্কৃতি, বিপণনযোগ্যতা ইত্যাদি কথাগুলো তো নানাভাবে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা চুঁইয়ে

চুঁইয়ে, আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়; কোন বিশেষ সংস্কৃতিটি কত দরে বিকোচ্ছে তার ওপরেই তার খ্যতি, গুণপনা, প্রচার নির্ভর করে এসব ব্যাপারও আমাদের একেবারে অজানা নয়। তাই মনে হতে পারে কলেজ ম্যাগাজিনে আবার এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা কেন, যেখানে এভাবে চলাটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক বলে মনে হয়! আর এভাবেই যে আমাদের সংস্কৃতি জীইয়ে থাকবে তাও খুব স্বাভাবিক, তাই না?

প্রশ্নটা এই স্বাভাবিকতার স্বরূপটা নিয়েই। আমরা নিজেরা যে পরিমণ্ডলে রয়েছি সেখানে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশগুলো আমাদের কাছে খুব পরিচিত; উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসর কিংবা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বইমেলা থেকে খাদ্যমেলা, নাটক কিংবা প্রতিবাদী লোকগানের আসর। কলকাতা ও শহরতলীর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো ঘুরলে দেখা যাবে ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ কোন না কোনভাবে এগুলোর অংশীদার হয়। এক এক করে বিষয়গুলো ধরলে কি দেখা যাবে? উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসর ভালো; কেন? না সেখানে ধ্রুপদী গানবাজনার স্বাদ নেওয়ার সুযোগ থাকে। বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বের সাথে লেনদেনের সুযোগ, সাংস্কৃতিক বা অন্যরকম। প্রতিবাদী লোকগানের মাধ্যমে তৃপ্ত হচ্ছে এই সমাজকাঠামোর মধ্যেকার নানারকম অন্যায় অসাম্যের ফাঁদে পড়ে ফুঁসতে থাকা যৌবন। মোটামুটিভাবে এইরকম যুক্তিগুলোই ঘুরে ফিরে উঠে আসে আমাদের কাছে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছ থেকে দাবী ওঠে এই ধরণের অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে খোদ নিজেদের কলেজ চত্বরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বা নবীন-বরণ-জাতীয় অনুষ্ঠানে। প্রশ্ন হচ্ছে এই চাহিদা করে আমরা কি পেলাম? এই পেলাম যে কলেজগুলোর ফেস্টিভ্যালগুলোতে কোনো বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার অভিনয় করে যায়, গাইতে আসেন নামজাদা কোনো শিল্পী অথবা বাজনার তালে তালে প্রাঙ্গণে হুল্লোড় তোলে কোনো বিখ্যাত রক ব্যাণ্ড। এরই মধ্যে স্পনসরশিপ জোগাড় করা, গেট পাস বিলি করা, মঞ্চবাঁধা কিংবা অনুষ্ঠান ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় উৎসাহী বন্ধুদের সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা। আমাদের নিজেদের পারফরমেন্স বলতে ওটাই। তবে একাজগুলো বড়জোর কোনো তথাকথিত অপটু অদক্ষ শ্রমিকের কাজের সাথে তুলনীয় হতে পারে। উত্তরণের প্রশ্নটি থেকে যায় অমীমাংসিত।

এ পর্যন্ত পড়ে হয়ত মনে হতে পারে যে, কলেজীয় বন্ধুদের উৎসাহ উদ্দীপনাকে বুঝি হেয় করা হল বা একজন শ্রমিকের কর্মতৎপরতার বুঝি কোনো দামই নেই অথবা এর মধ্য দিয়ে সমস্তরকম উৎসবের যাবতীয় পরিকল্পনাকেই নস্যাৎ করা হল বুঝি। একদমই তা নয়, বরং তার বিপরীত। আমাদের মধ্যে গান-গাওয়া, ছবি-আঁকা কিংবা বই-পড়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা তো মিথ্যে নয়। এগুলো সময়ের সাথে সাথে আরও বাড়বে তার থেকে আনন্দের কিছু হয় না। অথচ অত্যন্ত কৃত্রিম ও বিপজ্জনকভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষাপূরণের চেষ্টা হয়। কীভাবে? ধরা যাক, কোনো একটি গানের অনুষ্ঠানে মঞ্চে গাইছেন আমাদের খুব প্রিয় কোনো শিল্পী। অনুষ্ঠানটি হচ্ছে একটি সিগারেট বা ঠাণ্ডা পানীয়র ব্যানারে, কারণ তারাই অনুষ্ঠানটির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছে। সকলের সামনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত সংস্থাটিই সংস্কৃতির ধারক-বাহক। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, এই গোটা ব্যাপারটাই যেভাবে চলছে তাতে প্রকাশিত হয়েছে এর ভয়াবহ কৃত্রিমতা ও বিপজ্জনকতা। আখেরে বিপন্ন হলাম আমরা নিজেরাই। কারণ এমনিতেই সমাজজুড়ে 'সংস্কৃতি' বলতে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটির দ্বারা লালিত পালিত এবং মধ্যবর্গের কাছে চুঁইয়ে আসা ও তাদের দ্বারা সমর্থিত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের ধারণাটি চালু আছে। কলকাতার সমস্ত আর্ট গ্যালারী ঘুরে বিক্রীত শিল্পকর্মের একটা পরিসংখ্যান দিলে আমার

বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার হবে। এসব শিল্পকর্মের ক্রেতা কারা— কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা সংস্থা, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থিতিই বা কি— যার দাপটে প্রথিতযশা শিল্পী থেকে আর্ট কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত সকলেই সমঝে চলেন? বিলেতের সোদ্‌বী'স বা ক্রিস্টিস্-এর নীলাম ঘরে হাতুড়ির ঘায়ে যেসব নামপ্রকাশে অনিচ্ছুকরা মিলিয়ন ডলার শিল্পকর্ম কেনেন তারাই বা কারা? গান, কবিতা, ছবি এভাবে যে আরও বেশী করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের হাতের বাইরে চলে যায় আর স্রষ্টা হয়ে যান বিচ্ছিন্ন একক নিঃসঙ্গ তা দেখাই যায়-তার ওপরে যদি আবার এভাবে মূঢ় 'ব্যানারিজমের' মধ্য দিয়ে (অর্থাৎ উদাহরণটিতে যেরকম ব্যানার-সংস্কৃতির কথা বলা হল) প্রচারের ঢক্কানিনাদ চলে তবে সাংস্কৃতিক ক্লীবত্ব ও আগ্রাসনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এর উদাহরণ মিলবে হাতের কাছেই। ভারতবর্ষের অসংখ্য শহর, গ্রামগঞ্জ, অরণ্য-সংলগ্ন এলাকার ট্রাইবাল বা নন্-ট্রাইবাল যে সমস্ত সাধারণ মানুষ রয়েছেন তাদের অনেকের জীবনেই এক মস্ত অভিশাপের মত জড়িয়ে রয়েছে নানান শারীরিক ও মানসিক মাদক পদার্থ। এগুলোর আঘাতে বিঘ্নিত তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা বেড়ে ওঠা সৃজনশীলতা, যে সৃজনশীলতাকে আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি। এবারে ঐ জীবনঘাতী পদার্থের কারবারীরা যখন পলিথিনের প্যাকে বা টিভির প্যাকেজে তা বিক্রি করে মুনাফার পাহাড় জমিয়ে তারই একটা অংশ ব্যয় করে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে' 'ফোক-কালচার' বিকশিত করার চেষ্টা দেখান তখন তাকে ধিক্কার জানানো ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। ভণ্ডামির সংজ্ঞা কি বদলে গেছে! প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে এতে করে বুঝি বা আমার সংস্কৃতি বিকশিত হল— ঠিক এরকম আত্মপ্রসাদ আমাদের মনে জাগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফেস্টিভ্যালের সময়— কারণ এর মধ্য দিয়ে আমাদের সুপ্ত, ব্যর্থ, ঠিকভাবে বিকাশিত হতে না পারা অভীপ্সা পথ খুঁজে নিতে চায়। যখন দেখি চারপাশের সমাজ থেকে আর পাঁচটা লোক, আমার কলেজে একটা মেগা-প্রোগ্রাম দেখতে এল তখন যেন একপ্রকার তৃপ্তি হয় এই ভেবে যে এর মারফৎ প্রমাণিত হল আমার কলেজটিও গ্ল্যামারে কারো চেয়ে কম নয়। অথচ এই প্রক্রিয়ায় এরমধ্যেই দামী- হয়ে- থাকা শিল্পীরা আরও বেশী করে দামী হয়ে আমাদের হাতের বাইরে চলে যান। শুধু ফেস্টিভ্যাল কেন, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কোনো একটি উদ্যোগ ধরা যাক ফিল্ম ক্লাব বা ওরকম কোনো একটা মঞ্চ এভাবেই আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহিরাগত অর্থের পেশী আস্ফালনের শিকার হয়ে যায়। এখানেও শিল্প, শিল্পী, দর্শক, সমঝদার আলাদা আলাদা দ্বীপের মত।

কাছেই এই ভাবে সংস্কৃতির 'পৃষ্ঠপোষণ' যে বহুজাতিক মূলধনের বিনিয়োগ ছাড়া সম্ভবপর নয় সেটা আমরা বুঝে গেছি। কর্পোরেট স্পনসরশিপ একে বাঁচালে এটি বাঁচে, মারলে মরে। আর সারা বছর ক্লাসনোটস্-টিউটোরিয়াল-টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড-কম্পিউটার সামলাতে সামলাতে নাভিশ্বাস উঠে গেলে আমরা বিপন্ন জীবকুল কখনো কৃষ্টিদলের নাটকে, কখনো একস্ট্রা-ভ্যাগাঞ্জা জাতীয় রকগ্রুপের উপস্থাপনায় বা কখনো ধ্রুপদী নৃত্যে খুঁজে বেড়াই এই সংস্কৃতিকেই। পরনিধনকে মূলনীতি, ইঁদুরদৌড়কে মূলপন্থা করে 'The winner takes it all'-এর বাজারে একটা ক্লান্ত ছকে বাঁধা জীবনে কুশ্রী হিংস্র পরশ্রীকাতরতায় আচ্ছন্ন হয়ে ডুবে যেতে যেতে এই সংস্কৃতিতেই শেষ বিনোদন খুঁজি। সাফল্য- ব্যর্থতার দুই মেরুতে পেণ্ডুলামের মত দুলতে দুলতে জীবনের সুকুমার অনুভূতিগুলোকে হারিয়ে একটা ভালো চাকরী অথবা একটু ভালো প্রতিষ্ঠার আশায় দুলতে থাকে মানুষ নামক দু'পেয়ে জীবটি, আমরা প্রত্যেকে নিজেকে যা বলে দাবী করি। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবু সাধারণভাবে এ অবস্থায়

আমাদের ভরসা সেই সাংস্কৃতিক ঠিকেদারী, কর্পোরেট স্পনসরশিপ। 'জীবনযাত্রা এতটাই ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে যে কোনো শিল্পীর পক্ষে নিজের উদ্যোগে দাঁড়ানো বা অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। তাই কর্পোরেট জগতের এ ধরণের উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য,' বললেন সরোদিয়া আমজাদ আলি খান। কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পী স্বপ্নাসুন্দরী জানান, 'রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার স্বল্পতার কারণে বেসরকারী উদ্যোগগুলো শিল্পীদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ।' উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, স্পনসরশিপের চাঙ্গায়নী সুধা আমাদের রক্ষা করবে, এটা পাড়ার গানের আসরের উদ্যোক্তা থেকে সর্বভারতীয় নাট্যমেলার প্রযোজক সবাই এখন বুঝে নিয়েছেন। আর এই চাঙ্গায়নী সুধা-দানের কৌশলটি কোনো এক দেশে সীমাবদ্ধ নয়। এই সাংস্কৃতিক ঠিকেদারীর কান ধরে টান মারলে পেছনের মাথাগুলো সামনে চলে আসবে। কীরকম দেখা যাক। ঠিকেদারী, তার পেছনে শর্তাধীন সংস্কৃতি আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, তার পেছনে ভোগ্যপণ্যের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি-র প্রয়াস, তার জন্য আবার বিপুল সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে পৃথিবীজোড়া বিজ্ঞাপন, তার সাথে সাথে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের বাজারেও একচেটিয়া আধিপত্য, তার পেছনে বহুজাতিকের হাতে কুক্ষিগত মূলধন ও ফাটকাবাজি, আবার কৃত্রিমভাবে নতুন বাজার সৃষ্টির জন্য বাঁধানো যুদ্ধ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র নির্মাণে বিপুল সম্পদধ্বংস, আবার সেই সম্পদসংগ্রহের জন্য আরও বেশী বেশী করে অত্যাবশকীয় পণ্যের বাজার দখল, সেজন্য সেই বিশেষ বিশেষ পণ্যগুলোর বিপণনের জন্য ঢালাও স্পনসরশিপ তথা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণের নীতি। দেখা যাচ্ছে ঘুরে ফিরে আমরা সেই একই জায়গাতে ফিরে আসছি। সাহিত্যে বৃত্তান্ত রচনার একটি ধারা আছে যেখানে জীবনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করার পর চলমান বিন্দুটি পুনরায় বৃত্তের বাঁধাপথে এগিয়ে চলে। এই নব সাংস্কৃতিক ঠিকেদারী এভাবেই পৃথিবীতে আধিপত্য-বাদের বৃত্তটি সম্পূর্ণ করে। এর থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য কোনো প্রস্থানবিন্দু এই ছকটিতে নেই:

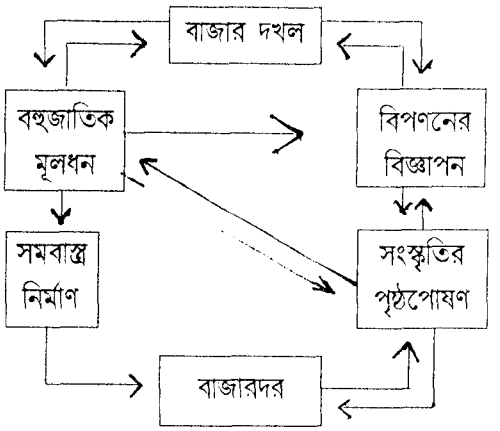

মজার ব্যাপার হল শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা পৃথিবীতে যে দুটি খাতে সবচেয়ে বেশী সম্পদ ব্যয়িত হয় অর্থাৎ যুদ্ধশিল্প ও বিজ্ঞাপন শিল্প— সে দুটোই হল স্রেফ অপচয়, কেননা সমাজে তার থেকে একটা পাইপয়সা ফেরৎ আসেনা। আজকের দিনে ১০০ টাকার মধ্যে যুদ্ধ ও বিজ্ঞাপন বাবদ ৪০ টাকা, ফাটকাবাজিতে ৪০ টাকা এবং খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে ২০ টাকা খরচ হয় [১৯৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নোয়াম চম্স্কি প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে]। এই তৃতীয় ক্ষেত্রটি ক্রমক্ষীয়মান। ১৯৯০ সালে ভারতের চারটি মহানগরীতে প্রথম সারির পাঁচটি বিজ্ঞাপন সংস্থা ব্যবসা করে ৩৬৩.৭৩ কোটি টাকা যা ১৯৮০ সালের তুলনায় ৮ গুণ। নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হওয়ার পর গত সাত বছরে এই অঙ্কটি নিঃসন্দেহে কয়েকগুণ বেড়েছে। ১৯৯৪-এ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো (যার মধ্যে ভারতও পড়ে) সম্মিলিত ভাবে প্রায় ৪৮৯৭২ কোটি টাকা খরচ করে প্রতিরক্ষা খাতে; সারা পৃথিবীকে ধরলে অঙ্কটা পৌঁছবে প্রায় ২৭২৩৩৫৭ কোটি টাকায় [Human Develo-

pment Report, UNDP, 1996]। ভারতের ক্ষেত্রে পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনীকে বাদ দিলেও প্রতিবছর সামরিকবাহিনীর একজন জওয়ানের পেছনে দু লক্ষেরও বেশী টাকা খরচ হয়। সেখানে ভারত পাকিস্তানের মত দেশগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনের জন্য মোট খরচ করে কেন্দ্রীয় বাজেটের ৫ থেকে ১২ শতাংশের মত। অস্ত্রশস্ত্রের কথা বাদদিলেও শুধু জওয়ানদের উত্তেজিত রাখতেই ভারত সরকার বার্ষিক ৭২ কোটি টাকা মদ কেনার জন্য ভর্তুকি দেয়! আবার দ্যাখ কী মজা, এই মদ্যপুষ্টদের হাতে নিগৃহীত জনজাতিদের সাড়ম্বরে 'আপনা উৎসব' জাতীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চে তুলে সংস্কৃতির ধুয়ো তোলা হয়! তাও এসব পরিসংখ্যান হল গোটা একটা মরুভূমি থেকে এক কণা বালি তোলার মত। এসব খাতে বিপুল ব্যয়ভার সামলাতে এবং আরও বেশী লাভের জন্য চাল-ডাল, পড়াশোনা, চিকিৎসা সবেরই দাম বাড়ে রকেটের গতিতে। ১৭টাকা থেকে ফি বেড়ে ৫০০ টাকা হওয়ার প্রস্তাব, পরিকাঠামোর অভাবে বাধ্য হয়ে বেসরকারী কম্পিউটার সেন্টারে দু হাজার থেকে এক লাখ টাকা খরচ করে শিক্ষালাভ কিংবা অশোক মিত্র শিক্ষা কমিশনে ব্লাড ক্যাম্প করে ছাত্রছাত্রীদের রক্ত বেচে হোস্টেল চালাবার সুপারিশ— কোনোটাই নতুন ঠেকে না। আর এই অবাধ লুণ্ঠনের সামনে পড়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে পড়া আমাদের চিত্রশিল্প, গান, চলচ্চিত্রের জগতে ঘুরে ঘুরে আসে সেই লুঠেরই একটা অংশ। একসময় আমেরিকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করে সোনার দেশ এলদোরাদোর সন্ধানে বেহিসাবী লুঠ চালাত স্প্যানিশ বিজেতারা, ইতিহাস যাদের কনকুইস্তদর নামে চিহ্নিত করেছে। এইভাবে ইনকা এবং আজটেক সভ্যতা ধ্বংসের কাহিনী আজ থেকে চারশ' বছর আগের কথা। আবার প্রায় শ' খানেক বছর আগে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারকারী বৃটিশ প্রশাসকদের মনোভাবটা ছিল এইরকম, 'ভারতকে রক্ত যখন ঝরাতেই হবে, তখন ছুরিটা সেই সেই স্থানে বসানো হোক যেখানে রক্ত জমে আছে।' [বৃটিশ পার্লামেন্টে বক্তৃতাপ্রদান কালে তৎকালীন ভারত সচিব, ১৮৭৫] আর আমাদের সময় দাঁড়িয়ে সেই একই নীতি আরও সূক্ষ্মভাবে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটু রং বদলে, একটু সাজ ফিরিয়ে উপস্থিত। "To those of you who wish to come to India, I say come there for long term. The last time you came to India to take a look, you stayed for 200 years. So this time if you come, you must come prepared to stay for another 200 years. That is where the largest rewards lie." হ্যাঁ ঠিক একথাই বলেছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ওয়াশিংটনের এক সম্মেলনে যখন দেশ-জুড়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঢাকে কাঠি পড়তে শুরু করেছে। এই আবাহন গীত যাদের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে 'কালচারাল ইভেন্ট' স্পনসর করার মানে হল 'ঠিক একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো', জানালেন কোনো এক কোম্পানীর এই বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। হোর্ডিং না দিয়ে তার বদলে এ ধরনের অনুষ্ঠান করলে 'good corporate citizenship' দেখানো হবে বলে মনে করেন তিনি। এজন্যই আজ এই ঠিকেদাররা ধ্রুপদী গায়কের থেকে পপগানের শিল্পীকে বেশী পছন্দ করেন কেননা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমাগত দর্শকসংখ্যা তথা সম্ভাব্য ক্রেতা প্রথম ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশী। তাতে যদি বিষয়টির গুণমান ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলেও। সেতার বাদন থেকে পর্নোগ্রাফিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কোনটাই এর বাইরে থাকে না। এভাবেই প্রতিনিয়ত রচিত হয়ে চলে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

আলোচনার শেষদিকে এসে মনে হচ্ছে জানি না কতটা নিজের মনোভাবটা তুলে ধরতে পারলাম। শত দুঃখ দাঙ্গা যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের জীবনকে আশ্রয়শূন্য করে সংস্কৃতিচর্চা ও সেই দুর্দশাকে স্থায়ী-করা-মানুষের সাথে

বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল। সংস্কৃতি সেখানে নির্মোকের মতো। আজকাল চারদিকে, শুধু আজকালই বা বলি কেন বিভিন্ন যুগেই বারবার শোনা গেছে শিল্পের শুদ্ধতা সততার কথা। আজকের স্রষ্টারাও, যার মধ্যে বহু কৃতী, প্রতিভাবানরা রয়েছেন তাদের প্রায় সবাই একটা সসেমিরা অবস্থায় পড়ে কোনভাবে নিজেদের অবস্থানটুকু রক্ষা করে চলতে চান, অন্তত নিজের নিজের শিল্পের প্রতি শুদ্ধ ও সৎ থাকতে চান। নিজের শিল্পের প্রতি শুদ্ধতা সততা বজায় রাখতে গেলেও এই আধিপত্যবাদ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর আছে কি? কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কোনো বন্ধুকে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে দেখলে কি একবারও মনে হয়না যে যদি বন্ধুরা মিলে একটা পাল্টা মঞ্চ করা যেত? এক্ষেত্রে উদাহরণ যে নেই তা নয়, জার্মানীর লোককবি-গায়ক উলফ্ বিয়ারমান যিনি পূর্ব-জার্মানীর রাষ্ট্রশক্তির দাপট মেনে না নিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন, পশ্চিমী মিডিয়া তাকে সেই সুযোগে ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চায়, কিন্তু তিনি সেক্ষেত্রে প্রতিবাদে পিছপা হননি। অথবা পোলিশ চিত্রপরিচালক ক্রিস্তফ কিয়েসলোস্কি, যিনি পশ্চিমী পুঁজিবাদের আপাত সমৃদ্ধি ও গ্ল্যামারে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েও পরে মোহমুক্ত হন এবং আমৃত্যু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিল্পের প্রতি যথাসম্ভব সৎ থাকাতে, নিজেকে বিকিয়ে না দেওয়াতে। এ না হলে কী করে রাখব আমাদের জীবনে অর্জিত এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রেখে যাওয়ার মত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার? প্রযুক্তির অমৃত খাইয়ে তো তাকে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, ব্যাহত হবে শিল্পীর নির্মাণ, তার অন্তর্বস্তু বা আঙ্গিক কোনটাই দাঁড়াবে না। অন্যদিকে? অন্যদিকে এমন এক সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা যেখানে প্রোমোটারের পৃষ্ঠপোষণে আয়োজিত ধ্রুপদী জলসায় এসে ব্রাত্যজন নিজেকে সংস্কৃতিহীন বলে মনে করবেন না বা পোশাকী ফোক্-কালচারের আবহে মাটির অন্বেষণ করতে হবে না।

কবে? কোন্‌দিন? কোন্ সুপ্রভাতে?

A Visit to Mattur

A Survey under the Language Diversity Programme

Dr. Prasanta Kumar Dasgupta
Department of Bengali

"Agacchantu"
(—Please come) was the word by which we were greeted by one of the persons we come across in the village 'Mattur' where the villagers speak in Sanskrit. It was a rare experience. By intonation the word also conveyed the sense of "you are welcome".

A team of 4 students of different departments of Presidency college went to participate in the National Integration Camp under the auspices of Sahyadri Science College, Shimoga in the Campus Diversity Initiative programme. Sohini Sengupta (Sociology), Debaleena Mojumdar (Statistics), Soumya Choudhury (Physics) and Projit Bihari Mukharji (Philosophy) were the members of team. The team was led by Dr. Prasanta Kumar Dasgupta of the Department of Bengali.

The Camp was organised from the 30th November to the 2nd December 1996. But the return-journey reservation from Bangalore could not be availed before the 5th December. The team decided to proceed to Bangalore via Mysore on the 3rd December by over-night bus-service. When the existence of such a village where villagers speak in Sanskrit was known from Shimoga, Presidency College Team decided to utilize the day by visiting the village, by having an on-the-spot survey of the village and by including that survey in the Language Diversity Programme (of the Campus Diversity Initiative). A trouble preve-

nted Sohini to move and Deboleena had to accompany her in the Hostel. Therefore, Projit Bihari and Soumya could accompany Dr. Dasgupta in the journeey to Mattur to conduct a survey under the Language Diversity Programme.

Mattur is 8km away from Shimoga and can be availed by bus service. The villagers are mainly "Sankethi" Brahmins. A girl of that sect, now a student in journalism of Sahyadri College, agreed to guide the Presidency College Team throughout the survey. Her name was Lakshmi, H.K. While leading us Lakshmi explained that this 'Sankethi' sect originally belonged to a place called 'Samkat' situated between Tamilnadu and Kerala and at least 500 years ago started moving towards northwest due to drought in the locality. They gradually came to Andhrapradesh at the time of Krishnadeva Ray and Tryambaka Ray. Then they moved towards Tamilnadu and after living there for some time finally settled in Karnataka. During this travel they collected old Telegu, old Tamil, Kannada alongwith Malayali words and included them in their vocabulary and made a dialect of their own also called 'Sankethi'. They generally use their own dialect in their domestic and daily life but never had forsaken Sanskrit, and in fact 'Sankethi' is full of Sanskrit (Tatsama) words also.

Sentence Stnuture, Lakshmi explained, of Sankethi is based generally on Kannada sentence syntax but the base of the dialect is Malayalam and Sanskrit.

English: I am reading
Kanada: Nam voduthiddene
Sanskrit: Aham pathami
Sankethi: No vodandrani

Dialect 'Sankethi' has three separate forms, one is '*Kaushiki Sankethi*', Kaushik being a village near Hassan district of Karnataka, second one is '*Bettadpura Sankethi*' Bettadpura is also situated near Hassan. The third variety is Lingadahalli, 'Halli means village in Kannada— (Can it be derived from 'Palli?' Palli → Phalli → Halli ?) the village Lingudahalli is near Chibmagalore.

From the enquiry in the village Mattur it was known that there are 72 households in the village and out of those 72 households, 62 belong to 'Sankethi' Brahmins'. The population of the village 'Mattur' is 500. Out of them at least 300 people speak always in Sanskrit and Sankethi. With the neighbourhood people they speak in Sankethi, but when they speak to elderly respectable persons they speak fluently in Sanskrit. Their means of communication generally is Sankethi and Sanskrit is their adopted language.

River Tunga is flowing by the West of Mattur village. There is a village on the other side of the Tunga named Hosahalli (Hosa means new and halli, as has been pointed out before, village). When Sankethi became over-populated some of the villagers settled on the other side of the quiet river Tunga. Our guide Sm. Lakshmi belongs to the village Hosahalli. In her name she carries the name of her village and her father's name Hosahalli Krishnamurthy Lakshmi or H K Lakshmi. (Just like the name of our former Prime Minister Sri. H. K. Devegowda— Hardanhalli Daddegowda Devegowda. Hardauhalli is name of the village from where hailed, Daddegowda being the name of his father.) Good many relations of Lakshmi reside in 'Mattur', naturally.

The villagers live on the cultivation of Areca nut i.e. *Supuri*. Harvesting season being September to December, the villagers remain busy during this time of the year (December). On the whole each family earns more than 1.25 to 1.50 lakhs on an average per year in the period by which they can plan for the rest of the year. Of course the income varies according to the size of the holding.

Menfolk of the village come to river Tunga for bathing after making morning prayers but the womenfolk come there only occasonally. They do not get any time to come to riverghat since they remain busy with their domestic

works. For cooking or other domestic purposed they have drinking water line connection in their houses.

An woman who was found washing clothes in the river was identified as a Tamil maid servant. One picuilier aspect was thus unfolded. Only Tamil Women are there in the village who have been waiting in different benos holder as helping hands. These Tamil families moved with the 'Sankethi' Brahmins all the way in Sankethis' search for settlement. Womenfolk of the Sankethi Brahmins converse with them in Tamil only.

It unfolded that the villagers are multilingual, They speak amongst themselves in (1) Sankethi Dialect— a dialect invented by Sankethi Brahmins only for themselves, intelligle neither to Kannada speaking nor Tamil speaking people, as admitted by one highly educated Tamil scholar though well conversant vill kannada (2) learn Kannada— as the medium of instruction in Karnataka is Kannada language in primary and secondary level; (3) learn English from secondary level and continues with the language in higher studies (4) understand Hindi, but that is a recent phenomenon, (they complained of Hindi network dominiion) (5) can speak also Tamil since they have to get their work done by non Brahmin Tamil women or Tamil labours who migrated with them, and finally (6) they have opted Sanskrit not only for religious rites but also as a medium for day to day conversation

The little village 'Mattur' was surveyed by the Presidency College team on foot.

Non— Brahmins of the locality live outside the village mattur on the eastern side of the road.

Sanskrit Pathasala is opened to both Brahmins and non-Brahmins, but non-Brahmins are not allowed to go inside the houses, not to speak of the woking places. Even the Tamil women are not allowed to come near the place where meals are served.

The village has a sanskrit 'Chatuspathi' or residential *tol* where Vedic scriptures are being taught. The head teacher of this *tol* a stout young man will long south-Indian Brahmin style hair-cut (shaven in the forehead portion and long thick 'tiki' in the back, which is knotted) teaches the young adolescent learners. His name is Sri M. Chandrasekhar Avadhani. Panini is taught with Bhattoji Dikshits commentaries. Krishna-yajurveda Branch is regularly taught here. The school gets help at the rate of Rs. 5000 per month from one Nityananda Saraswat Swami. from his own trust. Sri Avadhani is fairly well-read man, since he has read some of the Saratchandra Chattopadhyay's novels translated in Kannada, but he admitted that he has not read any of the works of and on Rabindranath Tagore save and except the criticism made by Saratchandra.

We met several people. In the house of one of the relatives of Lakshmi, our guide,Sri. M. Sanatkumar Sarma we met Sanatkumar's father and grand father Sri Markendeya Avadhani and Asvathanarayan Avadhani. Sanatkumars sister, a married lady Sm. Vijayalakshmi and Sanatkumars mother also received us inside their those and freely talked to us in Sanskrit. We could not reciprocate and only could convey 'abhysa nasti' that is we have not practised speaking in Sanskrit. They offered coffee and while we begged them not to add sugar in one cup of coffee they smiled and agreed: 'asharkaram, sasharkaram va' with or without sugar, will be served.

They informed that the family is proficient in music. The style which is a speciality in this portion of Karnataka is called 'gamaka' where literary flavours are added at the time of presentation (Lakshmi told us that she is also proficient in Music and in fact teaches a gruop of students).

We also met Sri M. Madhumarali, and Sri M. Narayan and some other elderly persons whose name we did not ask and therefore could not note.

A ferryman, we met on the river Tunga, ferried us through an iron tumbler over the river. We loitered on the other side of the river, outskirts of Hosahalli village where there are banana plantation, mango gardens and areca nut plantations. We did not enter the village for want of time. We came to know that the ferryman's two sons are camp engineers and well-placed. But the fact does not prevent him to continue his ferrying business, a responsibility allotted to him by the villagers. Nothing is to be paid by the villagers for crossing the river by tumbled boat, but he took Rupees 10/- form us as we were outsiders.

Some big boulders are strewn on the river-bed, so that in the summer they do not require the tumbler boat to cross the river and walk over the boulders in order to cross the Tunga.

We had one mid-day meal at the Vedanta Chatushpathi with rice, sambar and curd. We offered Rs 25/- as donation to chatushpathi which they readily accepted with thanks. While we asked the head-teachers, permission to leave the village he bid farewell by singing 'sivastv santu panthanum'— let your journey be quite good.

Lakshmi H.K. finally led us to her parents, residence at Shimoga when we got down from bus at Shimoga bus station. Here we met Lakshmi's brother Sri H.K. Vanda Subranyam (U. Hosahalli Krishnamurthee Shumukha Venkata Subranyam) and her mother.

Mattur, we gathered, is a village where people have opted for Sanskrit long ago and kept the tradition ongoing. It is a wealthy village from where many engineers, doctors, businessman came out. But however established in life they are, they refuse to severe connection with their village and come back to village on every occasion to attend this or that ceremony of this or that household— their near or distant relatives— where they eat together.

স্মৃতি প্রায়শই কৌতুকের, দুঃখের, সুখেরও

ধ্রুব গুপ্ত
প্রাক্তন ছাত্র
ইতিহাস বিভাগ

সতত সুখের বোধহয় এ জগতে কোনো কিছুই নয়। এমনকি স্মৃতিও নয়। তবে কোনো রকম সাধারণীকরণ না করাই ভাল। কেননা স্মৃতি যাদের সত্তায় সম্পূর্ণ মৃত হয়, সজীব থাকেনা, তাদের কাছে তা হয়তো মোটের ওপর সুখেরই হয় ; কিন্তু যারা বর্তমানে দাঁড়িয়ে সুদূর অতীতকে ছুঁতে পারে বা সুদূর অতীতও তার সমস্ত তাপ উত্তাপ নিয়ে যাদের বর্তমানে সজীব থাকে, স্মৃতি তাদের মনকে দূরকালের অরণ্যছায়াতলে নিয়ে যেতে পারে। সে ছায়াতলে সুখ দুঃখ কৌতুক সমসময়ে মিলেমিশে সহাবস্থান করে।

"অরণ্যছায়াতল"কে আক্ষরিক অর্থে নেবার দরকার নেই!— আমার চোখের সামনে এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ঢোকবার গেট, যার দুপাশে তখন অত দোকান ছিল না, (পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ায়) বাইরে রাস্তায় এত জনারণ্য বা যানজটও থাকত না। সেই প্রবেশদ্বার প্রত্যক্ষ করছি, তারপরে সিনেমার ক্যামেরা যেমন ট্র্যাক করে এগিয়ে যায় পাত্রপাত্রীর (বা দর্শকেরও হতে পারে) দৃষ্টিকোণের বিকল্প সেজে, সেই রকম করে কয়েক সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে আমিও একটু দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছি এখন যেখানে 'অ্যালামনাই' (অর্থাৎ বিরলকেশ নকল দাঁতের সমাহার,— কেশপ্রসঙ্গ স্ত্রী পুরুষ ভেদে পৃথক হলেও হতে পারে) অ্যাসোসিয়েশনের ঘরটা যা তখন রসায়নশাস্ত্র চর্চার জায়গা ছিল— তাকে ডাইনে রেখে

চলেছি— বাঁ দিকে হাতে লেখা দেয়াল-পত্রিকা পড়বে একটু এগিয়ে (এখন সেখানে নানা রকম নোটিশ ঝোলে), যে পত্রিকায় তৎকালীন মার্কসীয় আবহাওয়ার প্রভাবে ধর্মের আফিমত্ব নিয়ে আর বছর দুয়েক বাদে, মানে '৫৩ সালে, অশীন দাশগুপ্তর সঙ্গে তর্ক করার, দুঃসাহস হবে, তাকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। এসে দাঁড়িয়েছি বিখ্যাত সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে। '৫০ সালের সেই সিঁড়ির (যার তলায় ছোট ঘরে জালাভরা পানীয় জল থাকত "ছেলেবেলা" বইতে পড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির বর্ণনার মাফিক) গোড়াই আজ '৯৮ সালে আমার কাছে 'দূরকালের অরণ্যছায়াতল'। অবশ্য কোনোকালেই সেখানে প্রকৃতপক্ষে আলো ঝলমল করে না!

সেই প্রথম ধাপ পেরিয়ে দ্রুতবেগে উপরে উঠছি, হাতে 'ম্যাট্রিকুলেশন' (সেটাই শেষ বছর, এর পর তার নাম হবে 'ইস্কুল ফাইনাল") পরীক্ষার মার্কশীট্, উত্তেজনা এই ভেবে যে আমার 'ম্যাট্রিকুলেশন, অর্থাৎ প্রবেশ ঘটতে চলেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি কলেজে। অহো কী "উত্তরণ"। (সিঁড়ি দিয়ে উঠছি- সেটা হল উত্তরণের প্রতীকী উপস্থাপনা!) কিন্তু ও কী! তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হোঁচট খেলাম যে! এটাও কি ভবিষ্যতের প্রতীকী পূর্বাভাস! এই ভাবতে গিয়ে আত্মসমালোচনা, করতে হল তখনই, ছিঃ ছিঃ যুক্তিবাদীর পক্ষে এ কি প্রশ্রয় কুসংস্কারকে! এখন হলে মনে করতাম— এই রকমই তো হবার কথা— একই মানসে বিপরীতমুখী সরল ও জটিলের সহাবস্থান!

কিন্তু তখন আত্মধিক্কারের পর উঠে চললাম। মাঝখানের ল্যাণ্ডিং তার দুপাশে উন্মুক্ত খোলা দরজা (যা পরে ধর্মঘট করার সময় আমরাই বন্ধ করে রাখতাম "ভালো ছেলে"দের ঢুকতে না দেবার জন্য। এখানে 'ন্যারেটিভ'কে "সাবভার্ট" করে একটু বর্তমানের কথা বলে নিই! ১৯৯৬ সালে ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম স্টাফ রুমে অধ্যাপক সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, একজন সাম্প্রতিক 'ভলান্টিয়ার' আমাকে পুত্র বা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা— বিবাহের জন্য নয়, ভর্ত্তির জন্য— ভেবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার স্লিপ আছে?" পাঠক! 'ডাইপ্রেশন' মার্জনীয়!) হ্যাঁ, সেই লৌহনির্মিত খোলা দরজা আসতে একটু বাকি, আমার সামনে যেন সিনেমার একটি আয়তক্ষেত্র ফ্রেমে ধরা চতুষ্কোণ নীলাকাশের পটে শুধু গোল ঘণ্টাটা; তখনও পিছনের শোভাবর্দ্ধক গাছগুলি অতটা মাথা তুলে এক পায়ে দাঁড়ায় নি। এখন মনে হয় সেই ছিল ভাল,— কেননা এখনকার ছবিটা কিছু কিছু রেস্তোরাঁর দেয়ালে অথবা কোনো কোনো উঠতি বড়লোকের (যাদের ফরাসি ভাষায় 'নুভো রীশ' এবং হালের ইংরেজিতে 'ইয়াপি' বলা হয়) ড্রইং (থুড়ি, লিভিং) রুমের দেয়ালে সাঁটা ওয়ালপেপারের মতো ম'নে হয়। যে যাক তো, তখন তাকে চলচ্চিত্রের পর্দা বলেই ম'নে হয়েছিল। সে পর্দা স্বচ্ছ (transparent) না ঘোলাটে (opaque) এ নিয়ে যে পরে চলচ্চিত্রপণ্ডিতরা তর্ক করবেন তা কি তখন ভেবেছিলাম।

যাক, চলচ্চিত্রের কথা যখন উঠল তখন বলি—— এখানে ত আমি ঠিক প্রথাবদ্ধ 'ইতিহাস' রচনা করছিনা— স্মৃতিচারণের ন্যারেটিভে আমি তাই অবাধে ক্রনোলজিকে কলা দেখাব, ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্রের মতো ফ্ল্যাশ ব্যাক - ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড করেই চলব। তাই বলি, যখন লোহার গেটটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই তখন আরো বছর তিন পরেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে, এখানেই তা বলে নিই। কোনো এক ঘটনার ফলে সেই গেট বন্ধ করে দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদ সংঘটিত করছিলাম (ঘটনাটা বোধহয় ট্রামের-ভাড়া-এক-পয়সা-বাড়ানো জাতীয় কিছু)। আমরা অবশ্য সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ই-ই-ই-ই-ইন্-ক্লাব (অর্থাৎ ইনকিলাব) জিন্দাভ্যাদ্ (অর্থাৎ জিন্দাবাদ, পরশুরাম নমস্য— রামায়ণের নয়— 'কজ্জলী'র রচয়িতা) বলে আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে করতাম না— কারণ বোধহয় আমরা শুধু 'এস এফ' (তখন একটাই 'দল'

ছিল) ছিলাম। যাই হোক গেট বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলাম। তৎকালীন অধ্যক্ষ ধীর পদক্ষেপে উঠে বাংলাতে রোষকষায়িত লোচনে জিজ্ঞালেন 'গেটটা বন্ধ করে রেখেছো কেন?' আমি হাত কচলে জবাব কহি— "আমরা ছাত্রদিগকে উপরে না যাইতে অনুরোধ করিতেছি" (গুরুচণ্ডালী দোষ স্বেচ্ছাকৃত) উত্তরে ইংরেজি ভাষাতে শুনলাম "Don't deceive yourself! অনুরোধ করবার জন্য গেট বন্ধ করতে হবে কেন?" তখুনি আমরা গেট খুলে দিই; এবং অধ্যক্ষ অদৃশ্য হবার পর আধখানা বন্ধ করেছিলাম মনে আছে।

সেই বন্ধুটিও রসিকও ছিল— সাবধানী অর্থাৎ লাজুকও ছিল বোধহয়— কেননা ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যেই আমরা যখন বিকেলে 'শোভাযাত্রা' করে এখানকার সুবোধমল্লিক স্কোয়ারের দিকে (উল্টোদিকে বিধান রায় থাকেন সে বিষয়ে সর্বদা মন সজাগ থাকত) যাচ্ছিলাম সে শোভাযাত্রায় অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী, পার্থসারথি গুপ্ত আমাদের সহযাত্রী হয়ে গৌরব ও শোভা দুই বর্দ্ধন করেছিলেন— যখন সেই বন্ধুটি আমাদের সঙ্গে অনেকটা পার্থক্য রেখে ফুটপাথ দিয়ে (১৯৬১ সালে রাসবিহারী এভেনিউতে গুরুদেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'প্রভাতফেরির' সত্যজিৎ রায়ের মতো করে, বলা উচিত অবশ্য সত্যজিৎ রায়ই আমার বন্ধুর মতো করে, কেননা ১৯৬১ সাল এসেছিল ১৯৫৩র পরে।) সমান্তরাল ভাবে এগোচ্ছিল। পার্থসারথি গুপ্ত তাকে সস্নেহে "unsocial socialist" বলে তিরস্কার করেছিলেন। তখন 'ইন্‌টেলকচ্যুয়াল' হবার জন্য বার্নাড শ ক্লাশরুমের বাইরে অবশ্য পাঠ্য ছিল। "বুদ্ধিজীবী" চলত, কিন্তু 'আঁতেল', 'ফাণ্ডা' কথা চালু হতে তখনও অনেক দেরি! 'এন্‌থু'-ও!

"Unsocial" আমিও কম ছিলাম না; প্রকৃতপক্ষে এখনকার মতো তখনও আমি কাদের সামনে মন এবং মুখ খুলব সে বিষয়ে কঠোর নির্বাচক ছিলাম (ঔদ্ধত্য মার্জনীয়)। ফলে আমার সহপাঠীরাও অনেকে আমার সামনে 'আন্‌পার্লামেণ্টারি" শব্দ উচ্চারণ করা যায়না এই প্রতীতিতে আমাকে 'সেকেণ্ড চেম্বার" অভিধা দিয়েছিলো।

আজ সে কথা মনে করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, চাপা হাসিতে আমার মুখ হয় ফুস্‌কায়িত।

সে যাক্, আবার গোড়ার দিকের কথা বলি। লাজুক হবার একাধিক অ-স্বাভাবিক কারণ ও ছিল। তার মধ্যে একটি হল সাধারণ ইস্কুলের সাধারণ ফার্স্ট ডিভিশান 'ম্যাট্রিকুলেট্', বয়েস নিতান্ত কম— এখানকার ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রর মত— তখন ভার ফার্স্ট ইয়ারে প্রবেশ ও আই এ পরীক্ষা দেবে, বলে' কাজেই কুয়োর ব্যাঙের সাগরে পড়ার মতই দশা। কুয়োর ব্যাঙ তখন আর্টস্ লাইব্রেরিতে নিজস্ব কুয়ো অক্ষত রেখে যা পড়ত তার সঙ্গে হায়,— কী বলিব বর্তমানে পেশা অর্থাৎ স্নাতকোত্তর ছাত্রদিগকে ইতিহাস চর্চায় সহায়তা করার নাম করিয়া পরীক্ষার বৈতরণী পার করাইবার কোনো সম্পর্কই নাই। আমরা 'ত্রিশের তারা' তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নব্বইতেও নাচি (নাচবার কারণ অবশ্যই আছে। আর কোন্-কালে-ঘি-খেয়েছিল-আঙ্গুল-শুঁকে-দ্যাখ্ কথাটাতেও আশ্রয় আছে) কিন্তু তখনই বাংলা সাহিত্যের অন্য একটি ধারা— যা অনেক বেশি 'আর্বান' (তাই বলে নিছক মেকলের স্বপ্নসন্তান নয়) যার প্রতিভূ ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপ রায় (উপন্যাস— 'দোলা'), সর্বোপরি তৎকালীন অন্নদাশংকর রায় অর্থাৎ 'সত্যাসত্য' নামক ছ-খণ্ড উপন্যাসের রচয়িতা এবং গোপাল হালদারও ("একদা" "অন্যদিন" "আরেকদিন")— রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে এগিয়ে নিয়ে যান (ঐতিহাসিক অর্থে, গুণগত ভাবে নয়) এবং Novel of Ideas কে পুষ্ট করেন, চেতনাপ্রবাহ নিয়ে পরীক্ষা করেন— সেই ধারাটি তখনই তুলনায় অবহেলিত হতে শুরু করেছিল (এখন তাদের "মর্ডানিস্ট" বলে অনেকে গাল পাড়েন)— আমি

তখন কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার পথে সেই ধারাতে ডুব দেবার চেষ্টা করেছিলাম আজ যা দূরকালের অরণ্যছায়াতল (আর্টস লাইব্রেরিও খুব আলো-ঝলমল নয়!)।

আর্টস্ লাইবেরির অন্যরকম স্মৃতি আছে। ঐখানে পঙ্কজ মল্লিক, সুচিত্র মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাসের গান, শম্ভুমিত্রের আবৃত্তি খুব কাছ থেকে শোনার সৌভাগ্য হ'ত। পরে তাঁদের (পঙ্কজ মল্লিক ছাড়া) অনেকের সন্নিকট হবার সৌভাগ্যের ভূমিকা তখনই রচিত হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘরেই এ উপলক্ষ্যে অনেক কৌতুককর ব্যাপারও সংঘটিত হোত। একবার রবীন্দ্র তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা গুরুদেবের গান গাইছিলেন। একজন ছাত্রীর ধারণা ছিল তিনি গান করতে পারেন— যদিও তাঁর বাক্‌ভঙ্গির কর্কশতার জন্য তিনি 'সম্মার্জনী' (অর্থাৎ ঝাঁটা) উপাধি অর্জন করেছিলেন। (দয়া করিয়া এখানে নারীবাদ- পুরুষপ্রতাপ প্রসঙ্গ টানিবেন না, পাঠক!) তিনি, হার্মোনিয়ামের আর্তনাদের সঙ্গে 'জানি জানি গো দিন যাবে' গানটি গেয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে "আঙ্গিনাতে খেলবে শিশু" উচ্চারণ করতে গিয়ে "আঙ্গিনাতে চরবে শিশু" বলে ফেলেছিলেন! তখন ছাত্র-শ্রোতাদের মধ্যে একজন আগাম পাদপূরণ করেছিলেন— 'গরুরা গান গাবে" বলে চেঁচিয়ে উঠে। সেই গায়িকার কণ্ঠে পাখীদের আর গান গাওয়া হয়ে উঠল না।

আরেকবার ঐ সভাতে শান্তিদেব ঘোষ মশায় আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুষ্ঠানের তিনঘণ্টা আগে জানান— আসতে পারবেন না। দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন। বাংলাবিভাগের অধ্যাপক একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন— "উনি না এলে কী হবে জর্জ বিশ্বাস আছেন— তিনি একাই একশ" তাতে শান্তিদেববাবুদের সম্পর্কে ভাগ্নে, স্কটিশ চার্চ কলেজের একজন ছাত্র প্রচণ্ড সোরগোল তোলেন— রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'একো নি য্ য্ য্ ষ তো" সাধককে অ্যপমাঁআন্ন (অপমান) করা হয়েছে বলে (এতেও সুর ছিল স্বরলিপি করা যেত)। তাকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্সি-স্কটিশ রায়ট বাঁধার জোগাড়! মনে আছে করিডরে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে জর্জদা চোখ পিট্‌পিট্ করে বাঙাল ভাষায় বলেছিলেন "অমুকবাবুর ঐ কথা কওন উচিত হয় নাই"। 'উচিত' এর 'চ'টা কীভাবে উচ্চারণ করেছিলেন তা লেখা যাবে না— ওটি Oral Tradition — পাঠকরা কল্পনা করে নেবেন। পরে যখন এম-এ পড়ি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এ (অথচ) সর্ব্বক্ষণ আড্ডা মারি প্রেসিডেন্সির কমনরুমে বা পোর্টিকোর বেদিতে বসে সিঁড়ি দিয়ে কে নামছে কে নামছে না দেখতে দেখতে— হায় তখনও কি কল্পনা করিতে পারিতাম যে এম-এ পড়িবার মত অবস্থাতাড়িত দশা ভবিষ্যতে ঘটিবে!) তখন আর্টস্ লাইব্রেরিতে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। ধারাভাষ্য লেখেন শিশির দাস, পড়েন শম্ভুমিত্র (যা শুনে বিরক্ত হয়ে নিত্যপ্রিয় ঘোষ খুবই এলিটিস্ট এর মতো বলেছিলেন— "ছেঁড়াতার" চেঁচিয়ে কি রবীন্দ্রনাথ হয়। তখন কিন্তু "চারঅধ্যায়" মঞ্চস্থ হয়েছে, "রক্তকরবী" হতে চলেছে বা হয়েও যেতে পারে দু একটা শো। এতেও একটা intra Presidency কথার লড়ালড়ি হয়েছিল)। গানে ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, আলপনা রায় ও পূরবী মুখোপাধ্যায় (এখন বন্দ্যোঃ) সেখানেও জর্জদা যখন চেঁচিয়ে বলেন "সুচিত্রা জল খাইবেন না, আপনে আমার কথা শোনেন, চা খান"— তখনও 'চ' বর্ণটিও ঠিক ঐভাবেই উচ্চারিত হয়েছিল— ঐ বর্গের সব বর্ণই পূর্ববঙ্গীয় 'ডায়ালেক্‌টে' যে ভাবে উচ্চারিত হয়।

কফি হাউস এবং ওয়াই-এম-সি.-এ-র রেস্তোঁরা ছিল আমাদের মত আন্‌কোরাদের Initiation ক্ষেত্র (colonial anropology অর্থে নয়। intellectial growth যদি কিছু হয়ে থাকে তার এবং sociologyঅর্থে)। সেখানে একদিন আক্ষরিক অর্থে অকালপক্ক এক ছাত্র (এখন স্বনামধন্য) আমাদের কয়েকজনকে টেবিলে ডেকে বলেছিলেন— আসুন ভাই, "আমরা একটা Pseudo intallectual tea club গড়ে তুলি।" বলেই অবৈধ

যোনিসংসর্গ এবং লরেন্‌স্‌ নিয়ে এমন বক্তৃতা শুরু করেন যে আমরা পালাবার পথ পাই না। আমার এক বন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলেছিলেন, 'জেনে শুনে Pseudo করবি কেন? ন্যাকামি!' সেই বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী-ধন্য 'প্রডিজি'কে ত্যাগ করে আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ওয়াই এম-সি-এ রেস্তোরাতে গিয়ে বসতাম। পকেটে পয়সা তখন নগণ্য। তাই বেয়ারা যখন কেক্‌- পেস্ট্রি ভরা প্লেটটা টেবিলে ঠকাশ্‌ করে রাখত। তখন আমরা বলতাম "এই রে— "Temptation scene"! ইংরেজি পাস্‌ ক্লাসে তখন তারাপদবাবুর 'f' কে বাংলা 'ফ' উচ্চারণ করে (এখন যেমন অনেক ছাত্রকে দেখি বাংলা 'ফ' কে ইংরেজি "f' এর মত উচ্চারণ করেন যথা foolএ foolএ ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মিদু, মানে মৃদু বায় খুব সুষ্ঠ, মানে সুষ্ঠুভাবেই উচ্চারণ করেন)— আমাদের Othello পড়াতে শুরু করেছেন।

বড় পাস ক্লাসে আমরা খারাপ ছেলেরা পিছনের বেঞ্চে এমন একজনের পিছনে বসতাম যার বইয়ের বাহুল্য' আমাদের মত সুশীল (অলকরঞ্জন দাশগুপ্তর ভাষায় রোগা, মোটা মানে পৃথুল।) তিনজন ছাত্রকে আড়াল করে অপাঠ্য বই পড়ার সুযোগ দিত। সেই সব বড় ঘরে 'সেমিনার' হত এক সেমিনারে বাংলা বিভাগের এক ছাত্র 'শেষের কবিতা-র ওপর একটি 'পেপার দেয়'। তাকে 'সখী অমুক' বলা হত তার লালিমা পাল (পুং) ধরণের চেহারার জন্য কেননা পুরুষের লম্বা চুল রাখাকে language of protest বলে semiotic reading তখনও চালু হয়নি। তার প্রবন্ধের প্রথম লাইনে সাতটা বিশেষণে বিভূষিত করে অত্যন্ত পেলবভাবে রবীন্দ্রগোলাপ বলে রবীন্দ্রসাহিত্যকে রূপকায়িত করে 'শেষের কবিতা'কে তার একটি পাপড়ি বলে অভিহিত করেন। শ্রোতাদের মধ্যে পরমরসিক অর্মত্য সেন এবং সুনীতি ঘোষ ছিলেন। তারা বক্তার কী গতি করেছেন তা লিখে বোঝানো যাচ্ছে না, perform করে দেখাবার মত জিনিস! অর্মত্য সেন একবার শান্তিনিকেতনের শালবীথিতে একটি ছাত্রর 'মন হারিয়ে ফেলা' নিয়ে বেশ কৌতুক করেছিলেন এই বলে "তুমি নাকি তোমার মনটা শান্তিনিকেতনে ফেলে এসেছ এখন এখানে নিছক দেহ তো নিয়ে কী করবে?" সুনীতি ঘোষ একবার নিউ এম্পায়ার রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যাভিনয়ে অরুণেশ্বর কমলিকার শেষ দৃশ্যে 'বড় বিস্ময় লাগে'র আগে শাপ মুক্ত হবার নৃত্যভঙ্গি দেখে চেঁচিয়ে বলেছিলেন 'স্টেজে সাপটা কোথায় পড়ল অ্যাঁ?'

স্টেজের কথায় মনে পড়ছে, তখন বছরে ছাত্ররা ইউনিয়ন থেকেই বোধহয় একবার অভিনয় করত নাটক। সেটা রঙ্গমহল বা স্টার ভাড়া করে রবিবার সকালে করা হত। মেয়েরা আলাদা নৃত্যনাট্য করতেন (মঞ্জুশ্রী চাকীর নেতৃত্বে) কেননা ছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে পর্দার পাশে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেওয়া হত, কিন্তু তৎকালীন নীতিবোধ অনুযায়ী একত্রে নাটক অভিনয় করতে দেওয়া হত না। ফলত. উপায় ছিল স্ত্রীভূমিকা বর্ণিত নাটক বাছাই অথবা ছেলেদেরই মেয়ে সেজে মেক আপ করে গলার স্বরকে মিহি করে নারী ভূমিকাতে অবতীর্ণ হওয়া! দীর্ঘাঙ্গ পৃথুল অর্জুন সেনগুপ্ত পরশুরামের 'রাতারাতি'তে সাড়ি, 'রুজ্‌ পাউডার লিপস্টিক' ও পরচুলার আশ্রয় নিয়ে জিগীষাদেবীর চরিত্রে যে কী অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছিলেন তা অবর্ণনীয়! সেটাও perform করে দেখাবার মত। দর্শকদের কাছে ক্রমাগত "আওয়াজ খেয়ে" তিনি শেষ সংলাপটি কোনোমতে উচ্চারণ করে আর সংযত থাকতে না পেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে একলাফে প্রস্থান করেছিলেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। তুলনায় নেড়ীর ভূমিকায় এখন আমেরিকাবাসী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাল গাইতেন) বরং অনেক কম অবিশ্বাস্য ছিলেন নারী হিসাবে। সেটা তার কৃতিত্বের পরিচয় কিনা তা অবশ্য আমি বলতে পারব না।

এই অন্যায়ের (অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের একত্রে অভিনয় করতে না দেওয়ার) বিরুদ্ধে আমরা সক্রিয় প্রতিবাদ করেছিলাম কলেজের নাম ব্যবহার না করে 'কায়ানট'

নাম দিয়ে সংস্থার ব্যানারে ওয়াই.এম.সি.এ. হলে রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" অভিনয় করে যাতে ভারতী রায় কমলমণির চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। বর্তমান লেখকের অভিনয় ক্ষমতার ওপর তেমন আস্থা দলের অন্যান্যদের না থাকায় এবং তারা নিজেদের নিতান্ত নিপুণ অভিনেতা বিবেচনা করায় তাকে বড় রোল না দিয়ে 'নলিনাক্ষ'র চরিত্রে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং কনসোলেশন প্রাইজ স্বরূপ একটি মেয়ের সঙ্গেই (সে সত্যিই ভাল গাইত) উদ্বোধনী দ্বৈত সঙ্গীত গাইতে দেওয়া হয়েছিল। অর্বাচীন পাঠক, 'ইমাজিন' করিয়া লইও না যে 'এইরূপে প্রেম জন্মিল'।

কাজেই দেখা যাচ্ছে স্মৃতি অনেক সময়েই কৌতুকের। তজ্জনিত "হাসি" নিয়ে বের্গ্‌সঁ বা বাখতিন বা দেরিদা কী বলেছেন সে সব ভারি ভারি কথা এখানে থাক। যেমন থাক, দুঃখের স্মৃতির কথা— কোনো বন্ধুর অকাল বিনাশ, উন্মাদনা বা দু-এক উজ্জ্বল তারকার আত্মহত্যার কথা, ছোট ছোট বঞ্চনা প্রতারণার কথাও। বা প্রকৃত শ্রদ্ধেয় অনেক অধ্যাপকদের কথা, যাঁরা শুধু ক্লাসরুমে নয়, নানাস্থানে নানাভাবে বিশ্বের জানালাগুলি খুলে দিয়েছিলেন। সুশোভন সরকারের মন্থর পায়চারি করতে করতে মধ্যযুগকে 'ডার্ক এজ' বলার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার প্রারম্ভিক পরামর্শর কথা, বা আরো আগে একটু অন্যরকম বিদ্যাসাগরের সদৃশ গোপীনাথ ভট্টাচার্যের ইন্‌ডাক্‌টিভ লজিকের ক্লাশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঐরকম দৃশ্যগত সনাতনত্ব থেকে খাঁটি অক্সব্রীজ উচ্চারণে ইংরাজি শ্রবণ— এই লঘু নিবন্ধে সেসব কথা বরং থাক। আজ আবার সেই প্রতিষ্ঠানেরই কতিপয় ছাত্র এবং দুএকজন শিক্ষকের মাধ্যমে ঘটনাচক্রে রচিত আমার নিজস্ব শিক্ষক জীবনের (আশির দশকের কলেজ ম্যাগাজিনে আমার নামিবিয়া সংক্রান্ত একটি লেখা একজন তৎকালীন ছাত্র অনুরোধ করে নিয়ে ছেপে আমার পরিচিতি হিসাবে লেখেন— "চলচ্চিত্র সমালোচক ইত্যাদি, অবসরসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন"— একথার যাথার্থ্য নিরূপণের দায়িত্ব আমার নয়!) শেষ প্রান্তে এসে স্মৃতির জানালা আরো খুললে তা রুদ্ধ করা দুষ্কর হবে। তখন সত্যই অযথা "শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যা" সদৃশ আবহাওয়া তৈরি হবে। এখানে তাতে কাজ কী?

কিছু স্মৃতি, স্বীকারোক্তি

তপোব্রত ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্র
বাংলা বিভাগ

১.

ইংরিজি প্রথম বর্ষের চৌকশ ছাত্রটি প্রেসিডেন্সীর সেই বিখ্যাত সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে আলাপ শুরু করল, 'তুমিই তপোব্রত? ফার্স্ট ইয়ার বাংলা? আচ্ছা, তোমাদের এই বাংলা ডিপার্টমেন্ট ব্যাপারটা ঠিক কোথায় বলো তো?— তিনতলায়!' যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে তিনতলায় আবার আস্ত একটা বাংলা বিভাগ কোথায় থাকতে পারে। আল্‌তো একটা গোলাকৃতি বিস্ময় সে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারল তার মুখভঙ্গিতে। 'তিনতলায় ডানদিকে? ও! হ্যাঁ— হ্যাঁ, ওইদিকে একটা shadowy corner আছে বটে।'

Shadowy corner? এবার আমার অবাক হবার পালা। Shadowy কেন? বেশ তো পূর্বদিক-খোলা ঘরে ক্লাস হয় আমাদের, কতো আলোহাওয়া, জানলায় দাঁড়ালেই কলেজ স্ট্রিটের ট্রাম আর দাশগুপ্তর দোকান; বরং তোমাদের এই দোতলার পশ্চিমের ঘরগুলোই তো কেমন গুমোট আর অন্ধকার।

কিন্তু না। এসব কথা ভাবলেও সেদিন বলা হয় নি আমার। কারণ ওই 'shadowy corner' কথাটার লুকোনো অপমান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্যভেদ করেছিল।

দু'বছর পরে আমি আমার মতো ক'রে এর একটা

শোধ তুলেছিলাম। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার পর সেইসব আঁতেলরা একদিন আমাকে তাদের কফি হাউসের সঙ্গী হবার পরীক্ষায় পাশ করিয়ে নিল। পকৌড়ার প্লেট ঘিরে সিগারেটের ধোঁওয়ায় জমিয়ে তুলল র‍্যাঁবো, রিল্‌কে আর বোদলেয়রের বুক্‌নি; কখনো বা উঠে এল এলিঅট আর লুকাচের হাত-ফেরতা ময়লা একটাকার মতো ফেঁসে-যাওয়া সুভাষিত। তখনো লাকাঁ, ফুকো কিংবা বাখতিনের ফ্যাশন ওঠে নি।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমাকে কোণঠাসা করবার সূক্ষ্ম একটা চেষ্টা চলছে। সেই ছায়ামলিন কোণ। হঠাৎ, মরিয়া আমি, ব'লে উঠলাম, 'তোমরা নিরুপমা দেবীর উপন্যাস পড়েছো? আচ্ছা— বলতে পারো, বিষয়বস্তুর মিল কখনো সখনো থাকলেও নিরুপমার সঙ্গে অনুরূপার ভঙ্গির তফাৎটা কোথায়?'

কফিহাউসে নিরুপমা দেবী? এমন দুর্ঘটনার কথা কেউ কি কখনো ভাবতে পেরেছে? সূচিপতন স্তব্ধতায় কয়েকজোড়া চোখ নিথর হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

এরপর তারা আর কোনোদিন ভুলেও আমাকে কফিহাউসে নেমন্তন্ন করে নি।

২.

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্সীর ছাত্র ছিলাম বটে কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে যাকে বলে 'প্রেসিডেন্সিয়ান' তা হ'তে পারিনি একটুও। কোনোদিন কমনরুমে ঢুকি নি, ক্যান্টিন কোন্‌দিকে জানতাম না। মনে হ'ত, যে ব্রাত্য সে যেন অভিজাত পঙ্‌ক্তিভোজন থেকে নিজেকে দূরে রাখে। আর্টস্ লাইব্রেরির দেওয়াল জুড়ে অতীতের কতো জ্যোতিষ্ক-প্রতিম অধ্যাপকদের ছবি। খুঁজে বেড়াতাম, তাঁদের মধ্যে একজনও কি আছেন যিনি আমাদের বিভাগের। শমীকবাবু কেমন গর্ব ক'রে ব'লে গেলেন অমল ভট্টাচার্য আর তারকনাথ সেনের অধ্যাপনার ভিন্ন দুই ঘরানার কথা। ভাবতাম, আমাদের বিভাগে কি অধ্যাপনার তেমন কোনো একটা ঘরানাও তৈরি হ'য়ে উঠেছে যা নিয়ে ছাত্র হিসেবে গর্ব করা যায়, তর্ক করা যায়, অনুসরণ কিংবা অস্বীকার করবার প্রতিজ্ঞা করা যায়?

নিজেদের দিকে তাকিয়ে ক্ষোভ আরো বেড়ে উঠত। শুধু আমাদের কলেজেই নয়, সাধারণভাবে বাংলা বিভাগের ছাত্রদের বেশির ভাগেরই একটা নির্দিষ্ট ধরণ লক্ষ করতাম। এরা প্রায় সবাই কবিতার মতো দেখতে কী-একটা জিনিস অনবরত লিখে চলে আর সেইসব জিনিস অঢেল পরিমাণে ছাপাবার জন্য আরো একটা মুমূর্ষু ম্যাগাজিন বের করবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়। ভাবতাম, কী হবে ওসব লিখে? ওসবের একটা লাইনও কি থাকবে? আত্মকরুণায় সিক্ত এই আত্মপ্রকাশের নিশ্চিত শূন্যময় পরিণতির মধ্যে তো কোনো ট্র্যাজিক উপাদানও নেই, যা আছে তা শুধুই প্যাথেটিক। মনে হ'ত, আমরা কেন ভাবতে পারি না যে অধ্যাপনাও একটা সুসম্পূর্ণ শিল্পপ্রকরণ হ'তে পারে? একজন মানুষ তার সমস্ত সৃষ্টির আবেগ ওই একটা জায়গায় ঢেলে দিয়েই চরিতার্থ হতে পারে? খারাপ কবি হওয়ার চেয়ে ভালো অধ্যাপক হওয়া কি ঢের ভালো নয়? আর, এদেশে ভালো ইংরিজির অধ্যাপক হওয়ার চেয়ে ভালো বাংলার অধ্যাপক হওয়ার সুযোগ আর সম্ভাবনা যে অনেক বেশি সেটা আঁচ করতে পারাও কি খুব শক্ত ব্যাপার?

কাজেই আর্টস্ লাইব্রেরির পিছন দিকে একটা টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার টেনে এনে কিংবা লাইব্রেরির বাইরের চওড়া টানা বারান্দার যেসব জায়গা এখন মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে সেইসব জায়গায় আমি, এই অকালপক্ক সর্দার-পোড়ো, আমার 'ক্লাস' খুলে বসলাম। আমার সতীর্থদের মধ্যে অনেকেই, নারীস্বভাবের সকৌতুক করুণাবশতই হোক কিংবা পরীক্ষাপাশের অভ্যন্তরীণ উদ্বেগবশতই হোক, আমার সেই বেসরকারি ক্লাসে নাম লেখালো। যা যা পড়তাম, বাইরে থেকে যা যা শিখে আসতাম— এখন তা

যত তুচ্ছ ব'লেই মনে হোক— কখনো আমি তাদের কাছে গোপন করি নি। এখনকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেরিয়ারিজ্‌মের নামে পরস্পরের কাছে নিজেদের পরাশুনো আড়াল করবার যে কুশ্রী সতর্কতা লক্ষ্য করি, সেইধরনের কোনো সংকীর্ণ বিকার আমাদের মধ্যে একটুও ছিল না। আমার সহপাঠিনী-ছাত্রীরা যে সবসময়ে আমার সমস্ত কথা সবিনয় স্বীকার করে নিত তা কিন্তু নয়; তারা অনবরত উট্‌কো প্রশ্ন করত, আমার অনেক ভুল বের ক'রে দিত, কখনো-বা আমার সঘন বক্তৃতাকে স্রেফ বালভাষিত ব'লে হেসেই উড়িয়ে দিত। আর, এইভাবেই তারা সেদিন আমার পরম উপকার করেছিল। অল্প বয়সের অহঙ্কারে অনেক সময়ে ভেবেছি আমিই বুঝি দেনেওয়ালা। কিন্তু আজ বুঝতে পারি যে আমার অধ্যাপক-জীবনের সেই অস্পষ্ট সূচনাপর্বে তাদের দেওয়ার কোনো শেষ নেই। তারা আমার জড়তা ঘুচিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে আর বিরুদ্ধ-প্রশ্নকে স্বাগত জানাবার ঔদার্য শিখিয়েছে।
প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা বিভাগের কাছে এই ঋণই আমার সর্বোত্তম ঋণ।

৩.

১৯৭২ সালে আমি যখন এই কলেজের বাংলা বিভাগে পড়তে এলাম ঠিক তার আগেই একটি উত্তাল কালপর্ব শেষ হয়েছে। প্রেসিডেন্সীর সেইসব বিপ্লবী শোনপাংশুর দল কোথায় হারিয়ে গেছে, তাদের অশ্বখুরের ছিট্‌কে ওঠা লাল ধুলোয় অন্তিম রেশটুকুও মিলিয়ে এসেছে হাওয়ায়। আর, সেই স্বমহিম শূন্যস্থান ভরিয়ে দেবার জন্য ক্রমশ আসতে শুরু করেছে উত্তরকূটের নতুন ছাত্রদল। তারা বিপ্লবী নয়, তারা উদ্যোগী। আজ আমার চারিদিকে যেসব ছাত্রদের দেখে মাঝেমাঝে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়— তারা ছিল এই এদেরই প্রথম প্রজন্ম।
এইরকমই একটা সময়ে শারীরবিজ্ঞানের মাত্র দুটো ক্লাস ক'রেই মাঠ পেরিয়ে পালিয়ে এলাম, ভর্তি হলাম বাংলা বিভাগে। তখন মেঘনাদবধ পড়াচ্ছেন সুবোধবাবু। সুবোধ রায়চৌধুরী। কোনো কোনে অধ্যাপক থাকেন যাঁরা কী পড়িয়েছেন সেই মূল্যে নয়, তাঁরা নিজেরা কী সেই মূল্যেই ছাত্রের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। সুবোধবাবু ছিলেন ঠিক সেইরকম একজন অধ্যাপক। শুনতাম যে আদর্শবাদী এই বামপন্থী অধ্যাপককে না কি শিক্ষাবিভাগ থেকে তিরস্কার করা হয়েছিল যে তিনি যেন ক্লাসে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রচার না করেন। তিনি না কি উত্তর দিয়েছিলেন যে সেই বিশ্বাস প্রচার করা তাঁর শিক্ষাদানেরই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। একদিন, কোন্ প্রসঙ্গে মনে নেই, খুব তিক্তভাবে তাঁর কাছে ব'লে ফেলেছিলাম যে এদেশের কিচ্ছু হবে না; সুবোধবাবু তাঁর মন্ত্র স্নেহার্দ্র কণ্ঠে শুধু বলেছিলেন, 'so young and so sad!' আজকের বাংলার ছাত্ররা তাঁকে জানে না ব'লে মাঝেমাঝে দুঃখ হয়; আবার মনে হয় যে ভালোই হয়েছে যে তিনি আর বেঁচে নেই, তাহলে হয়তো তাঁর ওই কথাটা তাঁকেই আজ ফিরিয়ে নিতে হ'ত। যাঁর ক্লাসে আমি প্রথম বাংলা পড়তে প্রবেশ করেছিলাম তিনি যে কোনো শিক্ষাজীবী অধ্যাপক ছিলেন না, ছিলেন সুবোধবাবুর মতো শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক— এই দৈবঘটনাকে আমি আমার ছাত্র জীবনের প্রথম সৌভাগ্য ব'লে বিবেচনা করি।
সুবোধবাবুর কাছে পড়াশুনোর ব্যবহারিক দিকটা যে বিশেষ কিছু পাই নি এটা যেমন ঠিক তেমনি সেই জিনিসটা যাঁর কাছে আমরা সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলাম তিনি হলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। শ্যামাপ্রসাদ সরদার। এত পরিশ্রমী, আন্তরিক ও ছাত্রবৎসল অধ্যাপক সেইসময় আমাদের বিভাগে আর কেউ ছিলেন না। ফলে ছেলেমেয়েদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে তাঁর দেরি হয় নি। কোন্ প্রশ্নের উত্তর কী লিখতে হবে, কতোটা লিখতে হবে, কোন্ বইএর কোন্ জায়গাটা এর জন্য না প'ড়ে নিলেই নয়— এইসব আটপৌরে অথচ জরুরী তথ্য যেমন তিনি নির্বিশেষে জুগিয়ে যেতেন তেমনি সবচেয়ে প্রাণ-ঠাণ্ডা-করা এই

খবরটাও একটু নিচু গলায় তিনি সর্বসমক্ষে প্রচার ক'রে দিতেন যে অমুক প্রশ্নের উত্তরটা তৈরি করাবার কোনো দরকার নেই, এইবার ওটা আসছে না। তাঁর উচ্চারণের আঞ্চলিকতা নিয়ে অনুকরণপটু আমার কোনো সহপাঠিনী তাঁর সামনেই আমাদের প্রচুর হাসাতো কিন্তু প্রাক্‌পরীক্ষার বিপন্ন মুহূর্তে সেই মেয়েই যখন ব্যাকুল হয়ে তাঁর শরণ নিত তখন তিনিও দিব্যি খাতাপত্তর নিয়ে তার সঙ্গে বসে যেতেন। পরবর্তীকালে আমাকে অনেকবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে যে একজন অধ্যাপকের কোন্ গুণ সবচেয়ে বরণীয়— পাণ্ডিত্য না ছাত্রবাৎসল্য ? আমি প্রত্যেকবারই নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছি, ছাত্রবাৎসল্য। আর সেই প্রত্যেকবারই আমার সামনে ভেসে উঠেছে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদবাবুর মুখ।

একেবারে বিপরীত প্রান্তের মানুষ হলেন ভবতোষ দত্ত। শ্যামাপ্রসাদবাবু যদি সবচেয়ে আটপৌরে, তাহলে ভবতোষবাবু সবচেয়ে অভিজাত। গম্ভীর, সুপুরুষ, মুখে পাইপ গুঁজে ঋজু, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে থাকতেন। সেই সময়ে বাংলা বিভাগে মোহিতলালের ছাত্রশিষ্য ছিলেন দু'জন। একজন ভবতোষ দত্ত। অন্যজন হরনাথ পাল। আমি জানতাম যে মোহিতলাল বাংলায় moral এবং prescriptive সমালোচনাধারার একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। আমার সামান্য শক্তি দিয়ে আমি এই দু'জনের অধ্যাপনার মধ্যে মোহিতলালের বিশিষ্ট লক্ষণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতাম। হরনাথবাবুর বক্তৃতার কোনো কোনো শব্দবন্ধে মোহিতলালের সংহত ওজস্বিতার একটা আদল খুঁজে পেতাম ; ভবতোষবাবুর মুখের ভাষায় তেমন কোনো স্মারক অবশ্য খুঁজে পাই নি। তবে ভবতোষবাবু একবার আমাকে পাঠ্যতালিকার বাইরে কোন্ কোন্ বাংলা গদ্যের বই আমার অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত এমন একটা তালিকা তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন ; সেই তালিকা জুড়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অমূল্যবরণ বিদ্যাভূষণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর প্রায় সমগ্র মোহিতলাল। বলা দরকার, এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বই ছিল না। আমি এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের বিস্তার খুঁজে পেয়েছিলাম।

ভবতোষবাবু আমাদের 'রাজসিংহ' পড়াতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে আমার একটা ঋণ স্বীকার করে নিই। মবারকের কাছে, এবং উপন্যাসেও জেবউন্নিসার প্রথম সংলাপ হল, 'না খুঁজিতে যে আসে, সেই ভালোবাসে।' এই পঙ্‌ক্তিটিতে থেমে ভবতোষবাবু আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ইতিহাসের জেবউন্নিসা কবিতা লিখতেন ; বঙ্কিমচন্দ্র সেই তথ্যটা গোটা উপন্যাসে একবারও জানান নি ; অথচ আসে/ভালোবাসে— গদ্যসংলাপের এই প্রচ্ছন্ন অন্ত্যমিলের মধ্যে সেই তথ্যটা বিচ্ছিন্ন একটা তথ্য হয়ে আর থাকল না, চরিত্রের অন্তর্গত উপাদান হয়ে উঠল। টেক্সট্ যে এইভাবে পড়া যায় তা তখনও কেউ আমাকে শেখান নি। সেদিনের সেই রোমাঞ্চিত বিস্ময় আমার কাছে আজও অম্লান হয়ে আছে। পরে, যাদবপুরে একযুগ ধ'রে 'রাজসিংহ' পড়িয়েছি আর এই পঙ্‌ক্তিটির ব্যাখ্যা শুনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন সেই বিস্ময় লক্ষ করেছি তখন ভবতোষবাবুর কথা বারবার আমার মনে পড়েছে।

আমাদের সময়ে বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন হরপ্রসাদ মিত্র। বিভাগের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। তাঁর ইতিবৃত্ত বিষয়ে এই শুনেছিলাম যে গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ না কি তাঁকে একটি উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত কাব্যসংকলনে না কি তাঁরও একটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছিল। সকলেই বলত যে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি আর সমালোচক। আমি স্বচক্ষে তাঁর একটি গুণ লক্ষ করলাম। তিনি একজন বেশ রূপবান আর সুগন্ধ-প্রসাধিত মানুষ। 'জীবনস্মৃতি' থেকে টুকে বলতে ইচ্ছে হ'ত, 'একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমের মতো'। তাঁর আরো একটি গুণ ক্রমশ

টের পেতে লাগলাম যা চোখে দেখা যায় না, তাঁর ক্লাসে ব'সে উপলব্ধি করতে হয়। তিনি তিনদিনে 'শ্রীকান্ত' আর দু'দিনে 'নবজাতক' পড়ানো শেষ করলেন। কী ভাবে? প্রথমেই আমার 'নবজাতক' বইটি টেনে নিলেন। চোখ বুঁজে পড়লেন 'বুদ্ধভক্তি' কবিতা আর চোখ খুলে পাশে লিখলেন 'শব্দচিত্র'; আবার চোখ বুঁজে ফেলে পড়লেন, 'রাজপুতানা' কবিতা আর চোখ খুলে ফেলে লিখলেন 'আখ্যানধর্মিতা'। এইভাবে দু'দিনে পাঁচ ছ'টা কবিতা পড়লেন আর ওইরকম পাঁচ ছ'টা মন্তব্য লিখে দিলেন। ব্যাস্, বই শেষ। আর অবাক জলপানের মতো এই অবাক বইশেষের পর আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'দ্যাখো— বই শেষ ক'রে দিলাম, বলতে পারবে না কেউ যে ফাঁকি দিয়েছি।' হরপ্রসাদবাবুর লেখনীলাঞ্ছিত ওই 'নবজাতক' বইটি তাঁর সেই অপূর্ব অধ্যাপনার অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ হিসেবে আজও আমার কাছে রয়ে গিয়েছে।

একদিন হরপ্রসাদবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা বিষয়ে সেই বছরের পরীক্ষায় প্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম। 'সোনার তরী' আমাদের পাঠ্য ছিল। তিনি সীমাও বললেন, অসীমও বললেন, আর তারপর সুমধুর হেসে তাঁর টেবিল থেকে একটি লাল গোলাপ দুই আঙুলে তুলে আমার নাকের ডগায় ফুরফুর ক'রে ঘুরিয়ে দিয়ে প্রায় কানে কানে জানালেন, 'তপোব্রত! এই গোলাপটাকে কোনোদিন ভুলো না।' আমি বর্তুল চোখে হাঁ ক'রে সেই গোলাপটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম; কিন্তু ওটার মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে যে কী কী টিপ্‌স্ লুকিয়ে থাকতে পারে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝে উঠতে পারলাম না। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে যেতে যেতে ভাবলাম, 'হবেও বা, কবিদের অধ্যাপনা বোধহয় এমনিই হয়।'

কিন্তু প্রেসিডেন্সীর সমগ্র ছাত্রজীবনে যিনি আমাদের সকলের সবচেয়ে মনোহরণ করেছিলেন তিনি বিখ্যাত কেউ নন। আজকের বাংলা বিভাগ তাঁকে চেনে না। তিনি ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌম্যদর্শন প্রসন্ন মানুষ। প্রৌঢ়ত্বেই তাঁকে বৃদ্ধের মতো দেখাত। তিনি শাক্ত পদাবলী পড়িয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন এবং আজও মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। এইখানে আমার একটা পুরনো অনুযোগ জানিয়ে রাখি। আজকাল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ক্লাসে বৈষ্ণব পদাবলী আর শাক্ত পদাবলী যাঁরা পড়ান শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা বৈষ্ণব আর শাক্তদর্শন আদৌ পড়ান না। অথচ শুধু পড়ানো নয়, ছড়িয়ে আর খুঁটিয়ে পড়ানো এক্ষেত্রে জরুরি। যদিও ঠিক তুলনীয় নয়, তবু বলি যে মধ্যযুগের mystery আর miracle play ঠিকঠাক পড়াতে গেলে যেমন খ্রিস্টিয় ধর্মদর্শন না পড়ালেই নয়, ঠিক তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আর সহজিয়া বৈষ্ণবের দার্শনিক অবস্থানের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে না বুঝিয়ে শুধু আহা বাহা ক'রে চণ্ডীদাসের পদ পড়ানো যায় না, পড়ানো উচিত নয়। যাঁরা বলেন, ওসব তত্ত্বের কচকচি দিয়ে কী হবে, নিছক কবিতা হিসেবে পড়ানোই তো ভালো— তাঁদের এই শুদ্ধনন্দনবাদী অবস্থানের আসল কারণটি কিন্তু খুব পরিশুদ্ধ নয়। আসলে তত্ত্বালোচনার সামর্থ্যও তাঁদের অধিকাংশের নেই, তত্ত্বালোচনার শ্রমস্বীকারেও তাঁরা পরাঙ্মুখ। খোলাখুলিভাবে এই কথাটাও এখানে বলা দরকার যে 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' বইএর লেখক গত কয়েক দশক জুড়ে এই অধ্যাপনা-বিভ্রাটের নিমিত্তহেতু হয়ে আছেন। একথা ঠিক যে শুধু তত্ত্ব পড়িয়েই কাল কাটালাম, পদটা আর পড়ানো হল না— এই ব্যাপারের একটা প্রতিক্রিয়া তাঁর ওই বইএর মধ্যে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াকে তার যথাযথ অবস্থানে দেখাই সংগত। যদি এর ফল দাঁড়ায় এইরকম যে শুধু পদটাই পড়ালাম, তত্ত্বটা ছুঁলাম না আর দৈবাৎ যেখানে ছুঁলাম সেখানে ভুলভাবে ছুঁলাম তাহলে আবার নতুন একটা প্রতিক্রিয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে আমরা ওই বিভ্রাট থেকে রক্ষা পাই নি কিন্তু শাক্তপদাবলীর ক্ষেত্রে ননীবাবু

আমাদের বিপুলভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলার যেসব ছাত্রছাত্রী কৌলীন্যপ্রথা, গৌরীদান, অপাত্রে বিবাহ আর বাপমায়ের কান্নাকাটি— শাক্তপদাবলী বলতে শুধু এই শিখে দিন কাটায়, আমরা, ননীবাবুর ছাত্রছাত্রীরা, একসময়ে তাদের করুণা করতাম আর এখন তাদের জন্য বোধহয় দুঃখবোধ করি। ননীবাবু বোর্ডে এঁকে, মুখে ব্যাখ্যা ক'রে আর তারপর সেই ব্যাখ্যা ছোট ছোট কাগজে নিজের হাতে লিখে বিতরণ ক'রে ষট্‌চক্রভেদের প্রত্যেকটি স্তর আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; আগমনী বিজয়ার নিতান্ত মানবিক ভাবপর্যায়গুলিকে সেই চক্রপর্যায়ের উপর আশ্চর্য নিখুঁতভাবে স্থাপন ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে যাকে শুধুই পারিবারিক সুখদুঃখের গল্প ব'লে মনে হয় তার মধ্যে কীভাবে লুকিয়ে থাকে গুহ্য আর দুরূহ এক সাধনপ্রক্রিয়ার রহস্য। কিন্তু তাই ব'লে কি তিনি ওই বোধের সহজ ব্যাপারগুলিকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছিলেন? মোটেই না। বরং তাঁর কাছেই জেনেছিলাম, আঠারো শতকের এই বাংলা কবিতা স্বচ্ছ প্রসাদগুণকে সম্পূর্ণ অটুট রেখেই কিভাবে একই সঙ্গে রূপক আর না-রূপক হয়ে উঠতে পেরেছিল। পরে, এম. এ ক্লাসে, যখন 'রক্তকরবী' আমাদের পাঠ্য ছিল তখন নন্দিনী যে একইসঙ্গে প্রতীক আর না- প্রতীক— এই বিরোধাভাসের যুক্তিকে বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হয় নি। শ্রেষ্ঠ অধ্যাপনা ক্লাসরুমে হয়তো একদিন থেমে যায় কিন্তু আসলে তা কোনোদিনই থামে না— তার গভীরতর শিল্পরূপ নিত্য জায়মান, নিত্য পরিবর্ধমান।

৪.

আমার কথা প্রায় ফুরিয়ে এল, কিন্তু যাঁকে বাদ দিলে আমার সেই সময়কার কথা কিছুতেই ফুরোতে পারে না এবার তাঁর কথা বলি। তিনি আর্টস্ লাইব্রেরির প্রাণপুরুষ অকালপ্রয়াত প্রবোধ বিশ্বাস— আমাদের সকলের প্রবোধদা। প্রতিভাবান অমানুষ আমি এ জীবনে ঢের দেখেছি— নিছক প্রতিভার উপর আমার আর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। প্রবোধদার যে অসামান্য কোনো প্রতিভা ছিল তা নয়, কিন্তু তা না-ই বা থাকল, অমন মানুষ, অমন আশ্চর্যসুন্দর মানুষ কি বাকি জীবনে আর আমি দেখতে পাব?

প্রবোধদাকে আমি বলেছি, 'আর্টস লাইব্রেরির প্রাণপুরুষ।' কথাটা শুধু অলংকার হিসেবে বলি নি। তিনি নিজে ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন অথচ মন হ'ত আর্টস্ লাইব্রেরির যেখানে যা বই আছে, তা যে-কোনো বিষয়েরই হোক্ না কেন, সব যেন তাঁর নখদর্পণে। কোনো ছাত্র হয়তো তাঁকে জিগ্যেস করল যে ইতিহাসের কিংবা দর্শনের কিংবা বাংলার, এমনকি নৃতত্ত্বেরও, অমুক বইটা কি লাইব্রেরিতে আছে? হয়তো বেশ প্রাচীন আর দুষ্প্রাপ্য সেই বই— বিশেষ লেনদেন হয় না। প্রবোধদা বইএর স্তূপ থেকে মাথা তুলে, বিন্দুমাত্র চিন্তা না ক'রেই, মস্ত একটা ক্যাটালগ নম্বর অনায়াস মুখস্থ ব'লে গেলেন। অর্থাৎ বইটি আছে এবং এই নম্বরে স্লিপ জমা দিলেই বইটি পাওয়া যাবে। কী ক'রে একজন মানুষের এই অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি থাকতে পারে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না। প্রবোধদাকে যতবারই এই নিয়ে প্রশ্ন করেছি তিনি শুধু অল্প একটুখানি হেসেছেন। স্মৃতিশক্তি নিশ্চয় ক্ষমতার এলাকায় পড়ে, প্রতিভার এলাকায় নয়; কিন্তু গোটা লাইব্রেরির প্রতি যে অনন্যদুর্লভ ভালোবাসা থেকে এই স্মৃতিশক্তি জন্ম নেয় সেই ভালোবাসাই কি একটা আশ্চর্য প্রতিভার চিহ্ন নয়? একটু আগেই বলেছি যে প্রবোধদা প্রতিভাবান ছিলেন না— কথাটা এখন প্রত্যাহার ক'রে নিলাম। যে ক্ষমতাবান সে নিজের ক্ষমতার রহস্য জানে; যে প্রতিভাবান সে নিজেই জানে না এ কী জিনিস। আমার প্রশ্নে প্রবোধদার নির্বাক হাসির মানেটা এখন বুঝতে পারি।

প্রবোধদা যে শুধু একজন অসামান্য গ্রন্থাগারিক ছিলেন তাই নয়, নানা বিষয়ে, বিশেষত সমাজ ইতিহাস আর সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর পড়াশুনো ছিল প্রচুর।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন আর লালবিহারী সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেছিলেন। তাছাড়াও বহু বিচিত্র বিষয়ে তাঁর লেখা অসংখ্য ইংরিজি বাংলা প্রবন্ধ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে আছে। সেগুলি অবিলম্বে গ্রন্থিত ক'রে প্রবোধদার ছাত্ররা তাঁদের গুরুকৃত্য পালন করবেন— এই আশা করি। প্রবোধদার ছাত্র? তিনি তো অধ্যাপক ছিলেন না, ছিলেন গ্রন্থাগারিক। কিন্তু সে হ'ল বাইরের কথা। ভিতরের কথা হল এই যে তিনি অনেক অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো অধ্যাপক ছিলেন। আমি নিজেকে তাঁর একজন দীন ছাত্র ব'লে মনে ক'রে গৌরব বোধ করি। তিনি কি আমাকে শুধু বইএর খোঁজ দিতেন? আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টা আগে জেনে নিতেন আর তারপর ব'লে যেতেন কোন্ বইএর কোন্ লেখার কোন্ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমার জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সূত্রনির্দেশ মিলতে পারে। আর তারপর সেই ক্রস্ রেফারেন্সের অলিগলি দিয়ে যখন আবার বৃহত্তর গ্রন্থসমুদ্রের সম্পূর্ণ অজানা তীরভূমিতে গিয়ে পৌঁছতাম তখনও প্রবোধদাই নির্বিকার মুখে নতুন নতুন ক্যাটালগ নম্বর মুখস্থ বলতে শুরু করতেন। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে দেখতাম প্রশ্নের আদত চেহারাটাই কখন যেন আমূল বদলে গেল। মনে হ'ত, প্রবোধদার ছাত্র হওয়ার কত সুখ!

তারপর প্রবোধদার সঙ্গে আমার সম্পর্কে লাইব্রেরির চত্বর ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পথে আর তারপর ঢুকে পড়ল তাঁর জীবনে। প্রেসিডেন্সী ছাড়লাম কিন্তু প্রবোধদাকে ছাড়লাম না, তিনিও আমায় ধরে রইলেন স্নেহে আর সখ্যে। ক্রমশ বছর গড়িয়ে যেতে লাগল; ধুতি আর গেরুয়া পাঞ্জাবির প্রবোধদা শার্টপ্যান্ট ধরলেন আর সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিঁড়ে খসে যেতে লাগল তাঁর প্রসন্ন স্নিগ্ধ মুখশ্রী, ভেঙে পড়তে লাগল শরীর আর মন। ক্লান্তি আর ঘামে ঘোলাটে এক জনাকীর্ণ বিকেলে মির্জাপুরের গলি দিয়ে হাঁটছেন প্রেসিডেন্সী-ফেরৎ শীর্ণ হয়ে যাওয়া প্রবোধদা, পাশে আমি। একটা সামান্য খাবারের দোকান থেকে এক ঠোঙা মুড়ি কিনে খেতে লাগলেন সেই দুর্ভাগা ক্ষুধার্ত। আর তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন প্রাচী সিনেমার পিছনে সংকীর্ণ সর্পিল এক রাস্তার প্রান্তবর্তী মেসবাড়ির দোতলায়। কালো টিনের ছাদ আর বাঁশের খুঁটিওয়ালা চার পাঁচজনের এজমালি একটা ছন্নছাড়া ঘর, প্রবোধদার অস্থায়ী ঠিকানা। ভেতরটা সেই ভর সন্ধেবেলাতেও এত অসহ্য গরম যে আমি একমুহূর্তও টিঁকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে শুধু বললাম, 'প্রবোধদা, এ ঘরে আপনি কিছুতেই বাঁচতে পারবেন না।'

সেই তো হল, কিছুতেই বাঁচলেন না। ক্যান্সার ধরা পড়ল। প্রথম অপারেশন ব্যর্থ হল। ঘোর কর্কট তখন দাঁত বসিয়েছে সর্বত্র। কাজেই অস্ত্রাঘাত ছাড়া দ্বিতীয় অপারেশনেও আর কোনো লাভ হল না। প্রবোধদা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পরে আমি যাওয়া বন্ধ করলাম। কী হবে আর গিয়ে? প্রবোধদা চলে গেলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্কের একটা সুদীর্ঘ পর্বও যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। এখনও আর্টস্ লাইব্রেরিতে যাই, কিন্তু সে যাওয়ায় কোনো রস নেই, রোমাঞ্চ নেই আর। কেবল মনে হয়, তাঁর একটা ছবিও যদি লাইব্রেরিতে থাকত, দুর্বল মন সান্ত্বনা পেত যে তবুও এখানেই তিনি আছেন। যাঁরা এখানে ছবি হ'য়ে বাস করেন, জানি, তাঁরা জ্যোতিষ্কপ্রতিম, কিন্তু আমাদের প্রবোধদার জ্যোতিই বা কিসে কম?

তোমার চোখের আকাশ উড্ডীন গোধূলিতে

জয়শ্রী দে
তৃতীয় বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

সূর্যের কোন দোসর নেই, দোসর নেই শম্ভু মিত্রেরও। অখণ্ড সূর্যের দীপ্তি নিয়ে তিনি একক, নিঃসঙ্গ। তিনি বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অধ্যায়, এক ছায়াময় স্নিগ্ধ শীতল বিশাল মহীরুহ— যিনি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করেছেন নাট্যসংস্কৃতিকে। আপন জীবনদীপ জ্বালিয়ে শুরু করেছিলেন নবজাগরণের মহোৎসব। প্রচলিত ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে সর্বাঙ্গীন সৌকর্যে তাকে এক নতুন দিগন্তের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। কারিগরী কলাকৌশলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তিনি নতুন পথের দিশারী। স্তানিস্লাভ্স্কি যেমন পশ্চিমী থিয়েটারে একটা বিপ্লব এনেছিলেন, প্রাচ্যের বিশেষত ভারতীয় থিয়েটারে শম্ভু মিত্রও এক 'নয়া রাস্তার অন্বেষা'-য় পথিক হয়ে বেরিয়েছিলেন। চারপাশে ঘন হয়ে আসা বাণিজ্যিক অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটুখানি সততার দ্বীপের মতো একটা প্রতিবাদী নাট্যমঞ্চ গড়তে চেয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। তিনি শুধু বিরাট মাপের অভিনেতাই নয়, তিনি নাট্যপুরুষ। তাঁর ছিল ঈগলের মতো ঈর্ষণীয় দৃষ্টি, যা দিয়ে চারপাশটা দেখে নিতে পারতেন। বৈজ্ঞানিকের মতো মন ছিল যা দিয়ে সবকিছুকে নির্মোহ বিশ্লেষণ করতে পারতেন। ১৯৩৩-৪০ সাল নাগাদ নাট্যাভিনয়ের অদম্য বাসনায় ঢুকে পড়লেন রঙমহলে। কিছু পুরনো নাটকের পাশাপাশি করলেন বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়', প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ', অহীন্দ্র চৌধুরির

নির্দেশনায় 'ঘূর্ণি'। রঙমহলেই আলাপ হয় 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনিই শম্ভু মিত্রকে নিয়ে যান শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে। সেখানেও ছিল পুরনো নাটকের পাশাপাশি নতুন নাটক 'জীবনরঙ্গ' ও 'উড়োচিঠি'। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। 'আগুন', 'ল্যাবরেটরি', 'হোমিওপ্যাথি', 'জবানবন্দী'-র পর ১৯৪৪-এ 'নবান্ন'। বিজন ভট্টাচার্যের রচিত সেই নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে শম্ভু মিত্রও ছিলেন পরিচালক।

শম্ভু মিত্র, 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন মিলে তৈরী করলেন 'অশোক মজুমদার নাট্যসম্প্রদায়' (১৯৪৮)। এই নাট্যসম্প্রদায় থেকেই ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় 'বহুরূপী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে। শম্ভু মিত্রের পরিকল্পনায়, কর্মদক্ষতায় সাধারণ রঙ্গালয় এবং গণনাট্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে এ এক নতুন কর্মকাণ্ড। 'উজান গাঙ্ বাইয়া' দূরান্তের নৌযাত্রা।

আসলে শম্ভু মিত্র যখন 'বহুরূপী'-র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বাংলা থিয়েটারের মূল স্রোত খুব একটা স্রোতস্বিনী ছিল না। প্রাণহীনতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সর্বত্র। সেই মরা-গাঙের কথা মাথায় রেখেই তিনি একটা নতুন খাত খনন করতে সচেষ্ট তখন। একটা নাট্যপথ তৈরির অভীপ্সায় তাঁকে পরিচালনা করতে হয়েছিল এমন এক সংগঠনের, যার নাম 'বহুরূপী'— একটা ছোট্ট দ্বীপ, যেখানে একটা পরিবার বাস করছে নতুন সমাজ গড়ে তুলবার জন্য— এই ছিল আকাঙ্ক্ষা। অর্জুনের একাগ্র শর-সন্ধানের নিবিষ্টতার মতো তাঁর সমগ্র মেধা ও মননে ছিল শুধু থিয়েটার। আর এই থিয়েটারকে হাতিয়ার করেই সমাজবদলের উজ্জ্বল স্বপ্ন। ১৯৪৫-এ 'নবান্ন'-র সহ-অভিনেত্রী তৃপ্তি ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তৃপ্তিও যোগ দেন 'বহুরূপী'-তে। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়েই বহুরূপী যাত্রা শুরু। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ -এর মধ্যে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়— 'পথিক' (১৯৪৯), 'উলুখাগড়া' ও 'ছেঁড়াতার' (১৯৫০)। প্রথম ও শেষটির নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। আর অন্যটির রচয়িতা শম্ভু মিত্র। এরপর 'বিভাব' (১৯৫১) হয়ে 'চার অধ্যায়' (১৯৫১)। রবীন্দ্রোপন্যাসের নাট্য-রূপায়ণ দিয়েই 'বহুরূপী'-র রবীন্দ্র— পরিক্রমা শুরু। 'অন্ধ' শম্ভু, 'এলা' তৃপ্তি— যুগলে এক ইতিহাস তৈরী করেন। ১৯৫২ সালে প্রথম অনুবাদ নাটক ইবসেনের 'এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল' অবলম্বনে 'দশচক্র'। তারপরই ১৯৫৪-তে মঞ্চস্থ হল 'রক্তকরবী'। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ, সঙ্গীত; তাপস সেনের আলো আর শম্ভু মিত্রের অনন্য প্রযোজনায় এই নাটক ভারতীয় নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক ল্যাণ্ডমার্ক হয়ে রইল। এরপর, ডাকঘর, (১৯৫৭) থেকে 'পুতুল খেলা' [(১৯৫৮), ইবসেনের 'ডলসহাউস' অবলম্বনে]— রবীন্দ্রনাথ থেকে ইবসেন হয়ে শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে 'বহুরূপী' ভারতীয় নাট্যচর্চাকে এক ভিন্নতর ভাষা দেয়, দেয় আত্মপ্রকাশের এক অনন্যভঙ্গি, যা একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক থিয়েটারের হৃদয় ছুঁয়ে থেকেও একান্তভাবেই জাতীয়। ষাট ও সত্তরের দশকে বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় নানান মোড় ফেরা, এক অনির্বচনীয় বাঁকবদল। ১৯৬১-তে 'কাঞ্চনরঙ্গ' ও 'বিসর্জন'। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' বা সফোক্লিসের ধ্রুপদী গ্রীক ট্র্যাজেডি 'রাজা অয়দিপাউস' (১৯৬৪) যেমন করেছেন, তেমনই করেছেন বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৭) বা 'ত্রিংশ শতাব্দী' কিম্বা বিজয় তেণ্ডুলকরের 'চোপ আদালত চলছে' (১৯৭১)-র মতো আধুনিক নাটকও।

এরপর স্বেচ্ছা নির্বাসন। নির্বাসন পর্বেও একটা মহৎ কাজ করলেন— লিখলেন 'চাঁদ বণিকের পালা'। এই নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু মহানগরীর প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে এই নাটক পাঠ করে শুনিয়েছেন বহু বিদগ্ধ গুণীজনকে। শম্ভু মিত্রের যথোচিত বাচনভঙ্গিও অনুভববেদ্য। মননশীল পঠনের স্রোতে এইগুলির মধ্যে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে কুহেলিকা সরে গিয়ে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে ওঠে কবির অন্তরের ম্লান গোধূলির আলো,

বিষণ্ণ ধূসর হেমন্তের চিত্রকল্পময়তা। পাঠ শেষ হয়ে যায়, তবু রণন থামতে চায় না। নাট্যের বিভা শব্দের ওপর অনুক্ষণ ফেলে রাখতেন। স্পষ্ট উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণের সংযত দক্ষতা, বাচনভঙ্গি এবং উপলব্ধির জাদুতে স্পষ্ট কবিতাগুলি চৈতন্যকে জাগরিত করে। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তিতে তিনি ভাসমান কণ্ঠস্বরের বিবিধ ব্যবহারে উনি রাজা থেকে একান্ত সাধারণ সব চরিত্রই উজাড় করে দিতে পারতেন। হাজার হাজার শারীরিক ছবি তৈরি করতে পারতেন সেই নিতান্ত সাধারণ শরীরটি দিয়ে। এইভাবেই কোনো এক অজানা মুহূর্তে আবৃত্তি ও অভিনয় এসে মিলতো একটি যুগ্মবেণীতে। চকিত চাউনি, কণ্ঠের প্রার্থিত মীড়, এমনকি প্রায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও মঞ্চের নিখুঁত মাপ জেনে রইস জোয়ানের মতো চলাফেরা তোলপাড় তুলে দিতো দর্শকের বুকের অলিন্দে। আমার বয়ঃসন্ধির ভাঙাগড়ার দিনগুলিতে টেপ চালিয়ে আকণ্ঠ পান করেছি তাঁর গলার সেই 'তরমুজ রঙা দুর্লভ মদ', যার নেশা এ জন্মে আর 'মিটল না'। আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, স্বপ্নের ভিতর ঐ নস্ট্যালজিক স্বর্ণকণ্ঠের পুরুষটিকেই আমার গভীর, মগ্ন অবচেতন প্রথম লাজুক মালা পরিয়েছিল।

আসলে 'কেন'-র সম্মুখে নিজেকে দাঁড় করানো এবং অপরকে— আর তারই দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে স্বচ্ছ করে তোলবার প্রয়াস— এইটাই 'শম্ভু মিত্র' নামক ব্যক্তিত্বের প্রধানতম গুণ অথবা দোষ। আর ওই বিশেষত্বই বোধহয় অন্য সবার থেকে তাঁকে এত আলাদা করে দিয়েছিল, মানুষ হিসাবে। নিয়ত প্রতিকূলতার মধ্যে, স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় বেয়ে বেয়ে, মানুষকে সচেতন করবার, মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে ভীষণভাবেই একজন সামাজিক মানুষ, ভীষণভাবে ভাবিত সমাজ সম্পর্কে, সমাজ বা মানুষকে ভালবাসায় তাঁর যে কোন খাদ ছিল না— সেকথা তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন বারেবারে। অন্তরের শুদ্ধতা না থাকলে ব্যবহারিক অভিনয় হয়তো করা যায়— কিন্তু শিল্পের মাধ্যমে সত্যান্বেষণ করা সম্ভব হয় না— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

ঠিক এই জায়গাটিতেই বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের অনন্য স্বাতন্ত্র্য, যেখানে গিরিশচন্দ্র আশ্রয় করেন অলৌকিক পৌরাণিক প্রেক্ষাপটকে, কিম্বা শিশিরকুমার যেখানে নাট্যনির্বাচনের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেন বিলীয়মান ইতিহাসের অন্তরাগচ্ছটা— তাঁদের পরবর্তী যুগে এই দুই সারথী কিন্তু নাট্যাভিনয়ে সাংঘাতিকভাবে সমসাময়িক যুগজীবনের স্খলন-পতন-স্পন্দনকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। শম্ভু মিত্রের প্রত্যেকটি নাট্যনির্বাচন এবং প্রযোজনাকে মোক্ষমভাবে আঁকড়ে ধরেছে মরিয়া সমকাল। ১৯৪৪-এর 'নবান্ন' থেকে ১৯৮০-র দশকে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞানমনস্কতার স্বপক্ষে 'দশচক্র' নাটকের অভিনয় আমাদের একথার প্রমাণ দেবে। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই মানুষটি ছিলেন এক আপোষহীন সংগ্রামী। অনিবার্যভাবে সে প্রমাণ থেকে যায় তার জীবনে। শেষ ইচ্ছাপত্রের প্রতিটি শব্দে।

সম্পূর্ণ প্রতিকূল বাতাসেও এই যে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও আকাশে তুলে ধরা বিজয়কেতন— নিঃসন্দেহে এই ঘটনা আমাদের প্রজন্মেরও অহংকার। আমরা বুঝেছি, মানুষ মাঝে মাঝে হেরে গেলেও ভেতরে যন্ত্রণার বারুদ যদি জমে, তবে তার বিস্ফোরণ এভাবেই হয়। শম্ভু মিত্রের আত্মজা শাঁওলি যখন পরিবেশ আন্দোলনের স্বপক্ষে 'বিতত বিতংস' মঞ্চস্থ করেন, তখনও সেখানে অবশ্যই আমরা খুঁজে পাই তাঁর পিতার সমকালমনস্কতার যোগ্য উত্তরাধিকার।

ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রতিষ্ঠার আসল মুখের আড়ালে সৃজনীশিল্পের দায়বদ্ধতার যে মুখ তার মাঝখানে আজকের বেশিরভাগ তথাকথিত নাট্যদল সরাসরি অনুদান, কেরিয়ার, প্রতিযোগিতার পুরস্কারকেই একমাত্র লক্ষ্য করেছেন। এখানেও শম্ভু মিত্র এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনগুলিতে এই মানুষটি নীরব ছিলেন না কখনও। সেই বিষাক্ত আবহাওয়ার দিনগুলিতে নাটককে হাতিয়ার করে উভয় সম্প্রদায়ের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। 'ঘূর্ণি' নাটকে দাঙ্গার

দিনে জনৈক হিন্দু প্রাণের পরোয়ানা করে এক মুসলমান ডিমওয়ালা বৃদ্ধকে বাঁচাতে চেয়েছে। ১৯৪২-এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের টালমাটাল দিনগুলিতে নাটকের পৃথিবীতে তাঁর পথচলা শুরু। ডানাভাঙ্গা স্বাধীনতা, তেভাগা-তেলেঙ্গানার সংগ্রাম, দেশভাগের যন্ত্রণার্ত দিনগুলির কথাও উঠে এসেছে নানা নাটকে। বিপ্লবী আদর্শের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকলেও তিনি আসলে বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতায়। শম্ভু মিত্রের স্বরচিত নাটক, 'উলুখাগড়া'-তেও আছে এই মনের গভীরে ব্যক্তি-মানুষের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নের অভিজ্ঞান।

চলচ্চিত্রের তুখোড় অভিনেতা, কিম্বা জবরদস্ত লিখিয়ে শম্ভু মিত্রের কথা এই স্বল্প পরিসরের বলা সম্ভব নয়। তাই ওপথে হাঁটছি না। মানুষটি তো দশহাত দিয়ে শিল্পের ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছেন আকাশের আলোয়। নাটকে ও জীবনে শম্ভু মিত্রকে দেখার এই যে প্রয়াস, *জানি তাও ঐ প্রদীপ জেলে সূর্যকে দেখাবার* প্রয়াস বৈ তো নয়। কিন্তু কি করবো, ক্যাসেটে যখন আজো শুনি 'দিনান্তের প্রণাম', শুনি 'মধুবংশীর গলি', তখন ঐ কুহকী গলার আনুনাসিক টোন, এক দুর্মোচ্য নস্ট্যালজিয়া হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা দিয়ে যায় যে। আমোদগেঁড়ে, বেলেল্লাপনায় ঢলো ঢলো হালের আকাশপথের আক্রমণ, কেব্‌ল্‌ সংস্কৃতিও (!) তো পারল না সেই দুর্বার প্যাশনকে কেড়ে নিতে। হ্যাঁ, ঠিক এইখানটিতেই শম্ভু মিত্র নামটির ম্যাজিক। আর শুধু পারফরমিং আর্টের ক্যারিশমায় নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও আর একটা নতুন বিন্যাস তিনি গড়ে দিলেন। কোনো নেশাগ্রস্ত স্বপ্নে মজলেন না কোনোদিন। এমন একজন মানুষকে এই শতাব্দীর রাক্ষসী বেলায় দাঁড়িয়ে একটু স্মরণ করে মেরুদণ্ডটা ঋজু করে নিতে চাই।

এ বড়ো বেআব্রু ভাঙনের কাল বন্ধু। তবু মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত এই শম্ভু মিত্র নামের মানুষটি আচারবাহিত সংস্কারের খাঁচা লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে এতোটুকু দ্বিধা করেননি। মোহকে ভেঙেছেন রূঢ় বাস্তব দিয়ে। অথচ আজ অব্দি তাঁর বহুমাত্রিক জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে একটাও বড়ো বই লেখা হয়নি। এটুকু পরিসরে কিভাবে বলবো, সেই মোহর কুড়ানোর গল্প। 'প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা' শব্দটি তো এখনও 'উন্মাদ জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ'। তবু বড়ো স্পষ্টভাষায় 'ইচ্ছাপত্রটি'-টি লিখে গিয়ে এই মানুষটি কিন্তু তাঁর চারপাশে উড়তে দিলেন না শেষপর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিকতার বাজপাখিকে। আসলে জীবনের সঙ্গে শিল্পকে খাপে-খোপে মিলিয়ে দেখার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন তিনি। ব্যক্তি ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র এখানে একাকার। বোধহয় এই কারণেই সেইসময়, যখন ক্রমশ গোধূলির ম্লান আলো, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল রাত্রির কালো ডানা, তখন তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখ তাই উড়াল দিতে পেরেছিলো আদিগন্ত নীলাকাশে। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারেও মেলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি আলোর পোষাক। আর এখানেই চিন্তাশীল, আবেগী, সক্রিয় এবং সচেতন নাট্যকর্মীর যোগ্য উত্তরণ। আমাদের প্রজন্ম মঞ্চে তো তাঁকে সেভাবে পাইনি। তবু ঝাপসা-স্মৃতি আর হলুদ অভিমান বুকে নিয়ে বসে আছেন তাঁর নাটক— দেখা কিছু প্রবীণ দর্শক। শুনেছি তাঁদের মুখেই অনেক কথা। গাঢ় নিভৃত সেই অনুভবের কথা শুনে রক্তে দোলা দিয়েছে বৈ কি। উন্মোচিত হয়েছে স্বপ্নের নতুন দিগন্ত। আমার রুদ্ধশ্বাস বুকে খেলে গেছে মুক্তির হাওয়া। এমন একজন মানুষ হঠাৎই নিঃশব্দে চিরবিদায় নিলেন। অকস্মাৎ মনে পড়ে যায়, তরুণ লোরকা-র শোচনীয় মৃত্যুতে পাবলো নেরুদার সেই ব্যথিত, পরম উচ্চারণ— 'তুমি কত কষ্ট পেয়েছো, তুমি কত ভালোবেসেছো।' অথচ সেই কষ্ট, সেই ভালোবাসা দুকূলগ্রাসী 'অদ্ভুত আঁধার'-এর শায়িত চিতায় দ্রুত জ্বলে নিঃশব্দে ছাই হয়ে গেল উনিশশো সাতানব্বই-এর আঠারোই মে, মধ্যরাতে। যদিও জীবনে সম্মানিত হয়েছেন বহুবার (১৯৫৭-তে 'জাগতে রহো' ছবির জন্য কার্লোভিভারীতে 'গ্রাঁ পি' পুরস্কার, ১৯৭০-এ 'পদ্মভূষণ', ১৯৭৬-এ 'ম্যাগ-সাইসাই', ১৯৯২-তে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' ১৯৮৩-তে কালিদাস পুরস্কার, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী,

কলিকাতা এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সম্মানীয় 'ডি-লিট্' পান। তবু দর্শকের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনকেই সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছেন সারাজীবন।

প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, মানুষের অন্তরের মুক্তিতে চিরকাল শ্রদ্ধাবান শম্ভু মিত্র সেই গণনাট্য সঙ্ঘের সময় থেকেই কখনও কোনো প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য মেনে নেননি— একথা আমরা আগেই বলেছি। তাই মনে হয়, তিনিই 'দশচক্র'-র সেই একক সংগ্রামী ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ, 'চাঁদবণিকের পালা'-র সেই স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী চাঁদ সদাগর, যিনি জাতীয় নাট্যমঞ্চ চেয়েও পান নি, পাননি। কাঙ্ক্ষিত সহমর্মিতাও। তবু তিনি নিজের মত করেই অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর পাড়ি— দেওয়া। নাটকের পথে, শাশ্বতের পথে।

এমন একটি মহীরূহের আকস্মিক, নিঃশব্দ প্রস্থান বাংলা নাট্যজগতে নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি। যাঁর গোটা জীবনটাই ছিল এক অখণ্ড শিল্পকর্ম, এই সময়ে, অমন চুপি চুপি চলে যাওয়া, অবশ্য তাঁকেই মানায়। কথা বলে, ছন্দ গেঁথে তিনি আসলে সবচেয়ে তীব্র, মস্ত সত্য করে জীবনকে ভালোবাসতে চেয়েছেন। মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত শম্ভু মিত্র ছিলেন সজাগ ও সক্রিয়। নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে স্বরাজ্যে স্বরাট হয়ে তিনি বিরাজ করেছেন। কয়েকটি দশক জুড়েই তিনি বিস্তার। তাই পরবর্তী প্রজন্মের অনেক সফল স্রষ্টার মধ্যেই তাঁর কিছু না কিছু প্রভাব থেকে গেছে। অসাধারণ মঞ্চায়নের গুণে নিতান্ত সাধারণ গল্প নিয়ে লেখা নাটকেও দর্শককে তিনি সীটের প্রান্তে বসিয়ে রাখতে জানতেন শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায়, নাটকে চেনার মধ্য থেকেই তিনি বের করে এনেছেন অচেনাকে। ক্ষণকালে যোগ করেছেন চিরকালের মাত্রা। মানুষের ভেতরে নিদ্রিত অভিনেতার ঘুম ভাঙিয়েছেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সীমাহীন বেদনা আমাদের। শম্ভু মিত্রের উপমা খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে বহমান কোনো নদীর কাছে, পর্বতের কাছে, বজ্র নিনাদের কাছে, নির্ঝরের, কিশলয়ের কাছে, কীটাণুকীট থেকে মহৎ কোনো প্রাণের কাছে। ভূমি থেকে উত্থিত হয়ে প্রাণের আনন্দে বিশাল যে বৃক্ষটি সুনীল আকাশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, তার নাম রাখতে পারি শম্ভু মিত্র। তবু সারাজীবন নানা বিরোধিতা, কাজের পথে 'সারি সারি পাঁচিল' তাঁকে যন্ত্রণার্ত করেছে অবিরাম। প্রসঙ্গত মনে পড়ে জয় গোস্বামীর কতোগুলি পংক্তি: 'নিরুদ্দেশ নৌকা হয়ে ঘাট পার করে/ শেষে হাত স্বর্গ পায় কত/ উচ্ছ্বসিত, ফেনপূর্ণ, যে স্বর্গ পেয়েছ তুমি/ হে ক্ষতবিক্ষত!'

হ্যাঁ বন্ধু, চারদিকে 'বহুত আঁধিয়ার হো, মুঝে কুছ্ রোশনি চাহিয়ে'। চারপাশে তাবড় তাবড় দেশোদ্ধারকারীদের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ, নিরাশা, হতাশা আর বেকারী চোখে ধাঁধা জাগাচ্ছে যে। মনে পড়ে, আমাদের সিনে-ক্লাবে একটা পোলিশ ছবি দেখার অভিজ্ঞতা। আন্দ্রে হ্যাইদা-র 'ক্যানাল'। অনেক সঙ্গী-সাথী মিলে ছবিটি দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা। ওপরে যুদ্ধের ঘনঘটা, নিজেদের বাঁচাতে ঠিক বাংকার নয়, একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকে ঢুকে পড়েছে। একজিস্টেনশিয়ালিস্ট মেজাজের ছবি। অস্তিত্ব অনস্তিত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন নারী পুরুষ একগণ্ডুষে জীবনের যা কিছু অপ্রাপ্তি, তাকে পান করতে চেষ্টা করছে। দীর্ঘ সুড়ঙ্গ বেয়ে সেই ভায়োলিন বাদক তরুণ যখন শুঁড়িপথের শেষে এসে দাঁড়াল, তখন দেখতে পেল বহিঃপ্রান্তটির মুখ কাটাতারে ঘেরা, তার বাইরেই নদীর উন্মাদ জলোচ্ছ্বাস। তবু বাজনা সে থামায় নি। ঐ দুর্বিপাকেও।

আজ যখন সামনে-পেছনে কোথাও আমাদের পালানোর পথ নেই, খোলা বাণিজ্যবাতাসের এতোল-বেতোল ঝাপট খেয়ে প্রায় 'ন যেযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা, তখন আমার কাছে শম্ভু মিত্র ঐ ভায়োলিন বাদকের প্রতীকেই এসে হাজির হন। যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মাথা নোয়ালেন না একবারও। রাজা! কুর্ণিশ তোমায়।

বিষণ্ন অধ্যাপকটির যেসব কথা বলার ছিল

রাজেশ ভট্টাচার্য্য
তৃতীয় বর্ষ
অর্থনীতি বিভাগ

"যা হবেই তাকে হ'তে দেওয়া হোক"— বলে আমি রিভলভারের ট্রিগার টিপে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম বড্ড দেরী হয়ে গেছে কারণ যুবকটিকে আর বাঁচানো যাবে না। ওর কপাল থেকে উড়ে গেল প্রজাপতি আর ম্যাজিকের মত বদলে গেল পারিপার্শ্বিক, যেন নাটকের শিল্পীরা এই মাত্র বুঝলেন যে অভিনয়ের দিন শেষ আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে বুলেটের মসৃণ গতি আমাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। অথচ, বিশ্বাস করুন, আগের মুহূর্ত অবধি পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল যতক্ষণ না বুলেটটা বন্দুকের নল থেকে ছিটকে বেরুলো আর সময়ের বৃত্তটা আমার চারিধারে ঘন হয়ে এল, শরীরে ঘামের মতো, বা কোন বন্ধুর মতো যে কাঁধের ওপর হাত রেখে দৃশ্য বদলে যেতে দেখে আর আমি উপলব্ধি করলাম আমি এবং যুবকটি একই পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছি যেন দুজনকে আলাদা আলাদা ভাবে অথচ একই সময়ে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে হবে সামনের বিশাল খাদ আর এই মুহূর্তে আমাদের দুজনের পক্ষেই পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অথচ, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে, ঘটনাটা ঘটার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এমন কি ঘটনাটা আকস্মিক অনিচ্ছাকৃত বলেই মনে করি। আমি হলফ করে বলতে পারি, মহান ধর্মাবতার, যুবকটির মৃত্যুতে

আপনি এবং কোর্টে উপস্থিত লোকজন যতটা ব্যথিত আমিও ঠিক ততটাই, এমনকি একটু বেশিই কারণ আমি চোখের সামনে যুবকটির খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেতে দেখেছি। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করতে পারেন, ভাবতে পারেন আমি সেইসব লোকদের একজন যারা নিজের আঙুলের নখ থেকে নোংরা পরিষ্কার করতে বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু আমি চিৎকার করে বলব— এ কথার মানে কী? আপনাকে আমি বলিনি কিভাবে যুবকটি জানলা থেকে সম্পূর্ণ বহিরাগতের মত হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকেছিল আর বলেছিল, 'এভাবে হয় না'? আর আমি দিশাহারা হয়ে উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। ঠিক তখনই যে এই ঘটনাটা ঘটে গেল। আপনি বড়জোর আমাকে স্বার্থপর বলতে পারেন কারণ আমি নিজের চিন্তায় এবং নিজের গতিপথে বড় বেশী মগ্ন ছিলাম। হ্যাঁ, ভেবে দেখলে, আমি কিছুটা স্বার্থপর বটে, কারণ পাড়ায় নাগরিক কমিটি যখন বয়স্ক শিক্ষার জন্য চাঁদা বুঝতে এসেছিল, আমি একটি পয়সাও দিই নি, কেননা আমি মনে করি আমার কষ্টার্জিত পয়সা আমার বৌ-বাচ্চার পেছনেই খরচা হওয়া উচিত।

মহান বিচারপতি, আপনি নিশ্চিত থাকুন আমি অপ্রকৃতিস্থ নই, কারণ এরকম ধারণা আপনার বিচারবোধকে ভুল দিকে নিয়ে যেতে পারে। আসলে আমি একজন গভীরভাবে চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি কারণ সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। এরকমটা আমার মনে হয়েছিল অনেকদিন থেকেই, যখন আমি ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে মফঃস্বলের এক কলেজে ঢুকি। কলেজে আমি ছিলাম ইতিহাসের একমাত্র অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ছিল গুটিকয়েক আর অধিকাংশ দিনই আমি আমার নিজের ঘরে বসেই কাটাতাম। আমার ঘরে কোন ছাত্র আসেনি কোনদিন, কোন অধ্যাপকও নয়। শুধু মাঝেমধ্যে আসত প্রশাসন-সংক্রান্ত নানা সার্কুলার, যদিও আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না প্রশাসনের সঙ্গে আমি ঠিক কিভাবে যুক্ত। কিন্তু আমি নির্দিষ্ট দিনেই বেতন পেতাম আর এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে অবান্তর বলেই মনে হত।

দীর্ঘকাল ধরে কলেজে কাজ বলতে আমি শুধু নিজের টেবিলে বসে ভাবতাম যেন অধ্যাপকের কাজ ফুরিয়ে গেলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রাখার দায়িত্ব থেকে যায়। আমি ঘরের জানলা দিয়ে দেখতাম কিভাবে রাস্তার ধারের বিশাল বিশাল হোর্ডিংগুলো পাল্টে যায় মাসে মাসে আর আমার মনে হত পরিবর্তনের বাইরে অনেক কিছুই থেকে যাচ্ছে। ক্রমশঃ আমার মনে হল আমার ঘরটা যেন প্রাচীন সভ্যতার কোন গোপন কুঠুরী যেখানে সাংকেতিকভাবে জীবন নিজেকে বজায় রেখেছে— যেভাবে পায়ের ছাপ রেখে দেওয়া মৃত ব্যক্তির অথবা যেভাবে জন্ম-মৃত্যু সূচক সাল-তারিখগুলো জিইয়ে রেখেছে অস্পষ্ট ফটোগুলির ব্যক্তিদের এক নির্দিষ্ট সময়ের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু একথা কখনোই বলে না যে লোকটি তার জীবনকালে সুখী ছিল না বিষণ্ণ ছিল, আর তাই আমার মনে হল সময়সূচক যেকোন কিছুই আসলে দায়বদ্ধহীন, কোন ব্যক্তির কাছে। ধীরে ধীরে নিশ্চিত হলাম সময়-তারিখগুলো আসলে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন জ্যামিতি, আর সেই অর্থে সমস্ত ইতিহাসকেই প্রশ্ন করা যেতে পারে কারণ ইতিহাসে সাল-তারিখের গুরুত্ব অপরিসীম। আর আমি আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে নিস্পৃহতা আমাকে ব্যক্তিগত ইতিহাসের প্রতিও উদাসীন ও শীতল করে তুলেছে, নিজেকে ইতিহাসচ্যুত মনে করে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

আমি প্রতিদিনই যখন কলেজের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতাম, তখন বিশাল কাঠের সিঁড়িটা আমাকে প্রাচীন ও মুমূর্ষু করে তুলত, মনে হতো পুরো কলেজটাই ছত্রাকে ভরে গেছে। যদিও কেউই সেটা স্বীকার করতে চায় না কারণ সমস্ত কিছুই অপ্রয়োজনীয় ভেবে নেওয়ার চেয়ে দুঃসাহসিক আর কিছুই হয় না।

কিছুদিন আগে আমি আমার ঘরে ম্যাপগুলো খুলে

বসলাম কারণ আমি দেখতে চাইছিলাম আমি কোথায় আছি। কিন্তু ভারতবর্ষ খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত হলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম চোখের ভুল। তারপর জানলার কাছে ধরে খুঁটিয়ে দেখলাম, চোখের চশমা ভাল করে মুছে বারবার দেখলাম। শেষে কিছুক্ষণ বাইরের মাঠটায় পায়চারী করে এলাম নিজের উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে। আবার শুরু করলাম উত্তরে আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে, উরাল-এর পাশ দিয়ে এসে আফগানিস্তানের পর আর কিছুই চিনতে পারলাম না, অথচ কাছাকাছিই থাকার কথা ছিল। তন্ন তন্ন করে সবরুটা ম্যাপ খুঁজেও, পেলাম না। সেদিন ঘর থেকে বেরোবার সময় মনে হল সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

তবে কি সবকিছুই বদলে যাচ্ছে আর আমি কিছুই জানতে পারছি না, না কি আমিই বদলে যাচ্ছি অথচ আমিই সেটা জানি না। মুশকিল হল, আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমি এই বদলের পক্ষে না বিপক্ষে। আমার মনে হল সবকিছুকেই এখন প্রশ্ন করা যায় যদিও উত্তরগুলো নিয়ে কি করা উচিত আমি জানতাম না। এর কিছুদিনের মধ্যেই যখন আমার স্ত্রী আমার অল্প বয়সের একটা ফটো দেখাল আর আমি ফটোর যুবকটিকে চিনতে না পেরে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম, মনে হল, "নাহ্, সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে।" ইতিমধ্যে আমি ইতিহাসের সাল তারিখগুলো ভুলতে শুরু করেছি, কিন্তু সাহস করে কাউকে বলতে পারি নি।

আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই চিন্তিত ছিলেন আমার আচরণ নিয়ে, কারণ ততদিনে আমি অধ্যাপকের চাকরীটা খুইয়েছি, যদিও তা মাঝেমধ্যেই সাল তারিখ ভুল করার জন্য, না আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে এইজন্য— তা আমি কখনো জানতে পারিনি। একদিন ঝগড়া তুঙ্গে উঠল যখন সে শুনল আমি আমার ছোট্ট ছেলে তাতাকে বলেছি যে তার দাদু ছিলেন ইন্কা সভ্যতার মেষপালক। আমি আমার স্ত্রীকে বোঝাতে ব্যর্থ হলাম যে আমি মোটেই পাগল হই নি বরং এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু সে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। আমি নিরুপায় হয়ে চিন্তা করতে বসলাম আমার এরকম কেন হচ্ছে। আমার মনে হল, হয় আমি বর্তমান সমাজের তুলনায় এগিয়ে থাকা, নয় পিছিয়ে থাকা লোক আর সেইজন্যই আমার সমকালীন বলে কিছু হয় না। আমি বর্তমানের নিরিখে ইতিহাসও হতে পারি, ভবিষ্যৎও হতে পারি। সুতরাং বর্তমান সমাজে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে কারণ নিজের সময় নিয়ে সন্দেহে থাকা মানুষ কোন কাজে আসতে পারে না।

এই রকম সিদ্ধান্ত করে আমি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম দরজা। ঘর থেকে সমস্ত ক্যালেণ্ডার সরিয়ে ফেললাম, লুকিয়ে ফেললাম সমস্ত ডায়েরী, এমনকি সমস্ত চিঠিপত্রগুলো ফেলে দিলাম আর নতুন আসা কোন চিঠিপত্রই গ্রহণ করলাম না, কারণ যেকোন চিঠিপত্রের উপরেই আবশ্যিকভাবে তারিখ দেওয়া থাকে। এর পর আমি সরিয়ে ফেললাম সমস্ত খবরের কাগজ, ছিঁড়ে ফেললাম সমস্ত বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাগুলো যার ওপর প্রকাশনা কাল লেখা থাকে। এমনকি আমার দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর আঁকা ছবির ওপর যে তারিখ লেখা ছিল সেটা মুছে ফেললাম আর আমার বড় মেয়ের দেওয়া সমস্ত শুভেচ্ছা পত্রগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললাম যে তারিখগুলো যেন মুছে ফেলা হয় কারণ ওগুলো আমার বড় প্রিয় আর ওগুলো আমি ফেলতে চাই না।

এই সমস্ত কিছু করার পর আমার ঘরটা বেশ পরিষ্কার হল। আর নিজের বৃত্তটা সম্পূর্ণ করতে পেরে আমিও বেশ খুশি হলাম কারণ আর এমন কিছুই রইল না ঘরের মধ্যে, এমন কোন সময়ের চিহ্ন যা আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। একই সঙ্গে আমি সময় সম্পর্কে সচেতন ও তার থেকে নিরপেক্ষ হতে পেরেছি বলে মনে হল কারণ ঘড়িতে আমি সময় বদল হতে দেখছি, কিন্তু তারিখ বদল হতে দেখছি না। আসলে এরকম

নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলেই সময়কে সবচেয়ে বিমূর্তভাবে বোঝা যায় আর তখনই সেটা সঙ্গীতের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়।

অতঃপর আমার জীবনে কেমন একটা ছন্দ এল। এখন আমি শিল্পী হতে পারি, তখন আমি সৃষ্টি করতে পারি অসম্ভব কিছু; কারণ আর কিছুই আমাকে ধাঁধায় ফেলবে না, আর কোনকিছুই অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারি শতাব্দীর পর শতাব্দী, আমি নিপুণভাবে ছুঁয়ে যেতে পারি সমস্ত মুহূর্ত কারণ আমার সামনে কিছুই নদীর স্রোতের মত স্বচ্ছ, সাবলীল, যে নদীর উৎস ও মোহনা আমি জানি না, কিন্তু যে নদীর এক আঁজলা জল তুলে নিতে আপত্তি নেই, যে নদীর জলে গা ভাসিয়ে মাইলের পর মাইল চলে যাওয়া যায় কারণ কোন সীমারেখাই নেই যা নির্দিষ্ট করতে পারে নদীটিকে। আমি পাতার পর পাতা এবং পাতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঘরের দেওয়ালময় এঁকে বেড়াতে, লিখে বেড়াতে লাগলাম। শেষে ক্লান্ত হয়ে বসলাম ইজিচেয়ারে।

আমার মনে হল এই মুহূর্তে এটা আমার ছেলেকে জানানো উচিত কারণ একমাত্র সেই এটা বুঝতে পারবে। আমি আমার ছোট তাতাকে কোলে নিয়ে বললাম, "তুমি নিশ্চয় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও।" পৃথিবীর সমস্ত সারল্য মুখে মেখে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, একদম শুরু থেকে বলো।"— আর আমি সেই মুহূর্তে দিশাহারা হয়ে গেলাম, কারণ ঠিক সেইটাই আমি জানি না আর আমি মনে মনে বললাম, "হা ঈশ্বর, এরকম সময়ে আমি বাঁচতে চাই না।"

আমি দৌড়ে আমার ঘরে এলাম, মাথার রগ টিপে ইজিচেয়ারে বসলাম কারণ আমার বুক ধড়ফড় করছিল আর আমি ক্রমশঃ অনুভব করলাম আমি তরল পদার্থ হয়ে প্রথমে ইজিচেয়ারের ও তারপর ঘরের অসম্পূর্ণ চৌকো আকার ধারণ করছি, আমি বুঝলাম এই সেই মুহূর্ত আর নিজেকে সংযত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেওয়াল থেকে তুলে নিলাম ক্রশ আর দুহাতে ক্রশের দুটি প্রসারিত বাহু ধরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। কোন দিকে যাব? শুধু বুঝতে পারলাম, এইমাত্র ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে। আমি সিঁড়ির দেওয়াল ধরে নেবে এলাম, গলির শ্যাওলা ও ফাটল-ধরা-দেওয়াল ধরে এগিয়ে গেলাম এবং ক্রমশঃ মাঠের ধারে ফ্যাক্টরির লম্বা দেওয়াল ধরে এগোতে লাগলাম। আমার হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে গেল, আমার দুহাতের আঙুলের চামড়া উঠে গেল। আমি অনেকক্ষণ এরকম করে চলার পর সরে থাকতে না পেরে আমার ছায়াটাকে বলে উঠলাম, "আমি আমৃত্যু তোমার সাথে লড়তে পারব না।" ছায়াটা ধমকে বলে উঠল, "তুমি মূর্খ, সূর্যটা ঘুরে গেলেই আমার থেকে মুক্তি পাবে।" যদিও সে ধৈর্য্য আমার ছিল না, ফলে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়তে লাগলাম সূর্যের দিকে। যেদিকে সূর্য ডুবে গেছে আর আমি মুখ থুবড়ে পড়েছি কাদামাটিতে। কারণ আমি জানতাম না কোনদিকে যেতে হবে আর ক্লান্তিতে সেখানেই পরে রইলাম সারা রাত।

পরদিন ভোরে ফিরে এলাম নিজের ঘরে, ইজিচেয়ারটায় বসে ভাবলাম আমার উত্তেজিত হওয়া ঠিক হয় নি, বরং আবার নতুন করে শুরু করার মত যথেষ্ট সময় আছে। ঠিক তখনই জানলার গরাদে যুবকটির মুখ দেখা গেল আর ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলে উঠল, 'এভাবে হয় না'। আর তখনই আমার মাথায় খুন চেপে গেল, আমি একলাফে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম, বলে উঠলাম 'যা হবেই, তাকে হতে দেওয়া হোক' আর আমার হাত পড়ল বন্দুকের উপর আর যুবকের কপাল থেকে উড়ে গেল প্রজাপতি আর আমি বুলেটের মসৃণ গতিতে বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম আর চোখের সামনে দেখলাম কিভাবে একজন দেখতে দেখতে তার বর্তমান সময়কে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে। যদিও, শেষ অবধি, যুবকের মৃত্যুটি দুঃখজনক।" এই বলে বিষণ্ণ অধ্যাপকটি থামলেন এবং লক্ষ করলেন ইতিমধ্যে বিচারালয়ের স্থাপত্য বদলে গেছে।

मुक्ति-काव्य

बागेश्री मित्रा
हिन्दी (प्रतिष्ठा) तृतीय वर्ष

दीप की जलती हुई शिखा,
मेरी आत्मा को छूती हुई पदार्पन कर रही है,
आसमान की रगंभूमि पर—
जहाँ
मेरी कल्पना रंगीन उपन्यासों की सृष्टि के लिए बेचैन है।
और
मेरा अस्तित्व वेदना की असीम धारा से गुजरता हुआ,
शिशिर बन भिंगो रहा है नवजात कलियों को...।
जो कलियाँ फूलो की पवित्रता समेटकर,
उस चेतन-भूमि पर जा गिरेगी—
जहाँ मेरी जड़ता एकबार पिर चैतन्य पाकर,
शब्द और वाक्य को साथ लेकर चल पड़ेगी,
मुक्ति-काव्य की कल्पना सजाने॥

क्योंकि समय एक शब्द है...

सोम सारस्वत
हिन्दी (प्रतिष्ठा) तृतीय वर्ष

क्योंकि समय एक शब्द है
और शब्द
हमेशा एक अर्थ को लेकर चलता है
और अर्थ ही
एक वाक्य को सार्थकता प्रदान करता है
और सार्थकता
सर्वदा अग्रगामी है।
चूँकि समय एक शब्द है
इसलिए उसे भी
आगे ही बढ़ना है
और इसी में निहित है
सार्थकता उसकी
करता उसका अस्तित्व निर्भर
और सर्वशेष में
समय एक घटना का
अधजला अंश भी है।
इसलिए
उस विगत समय का—
दाह-संस्कार आवश्यक है।

अनुभूतियाँ भी तो रोष हैं

सतीश कुमार सिंह
हिन्दी (प्रतिष्ठा) द्वितीय वर्ष

आजकल मैं
रो-रोकर हँसता हूँ,
पर मौका पाते ही
भागते माहौल पर फिकरे कसता हूँ।
आगे इसके
संवाद और भी हैं
कहानी और भी है
कथ्य-तथ्य और भी हैं
सुनना और भी है
कहना और भी है
पर भागता माहौल मुझे
पंगु बनाकर खिसकाता है।
यह दयनीय जीवन किसका है?
मैं उसी भागते माहौल से
पूछ बैठता हूँ।
अतृप्त बिखरा पड़ा है वह;
मेरे प्रश्न की जबाबदेही
क्या भायेगी उसे?
मैं नहीं जानता!
आखिर
आगे के प्रतिक्षण बदलते
जीवन की
अनुभूतियाँ भी तो शेष हैं।

विकल्प ?

सुनील कुमार द्विवेदी
तृतीय वर्ष
हिन्दी प्रतिष्ठा

आज यहाँ पाँचवा दिन है। प्रमिला को प्रकृति से बहुत स्नेह है। पहाड़ो पर उसे बहुत अच्छा लगता है। आज कई सालों बाद वह कंचनजंघा आई है। बचपन में जब 'बोर्डिंग' में थी तो 'टीचर' के साथ आई थी। कुछ भी तो नहीं बदला। सब कुछ वैसा ही तो है; कुछ बदला है तो प्रमिला का स्वभाव; कैसा कड़वापन आ गया उसके स्वभाव में। पहले उसे ऐसा लगता था कि सुबह की पहली किरण से कंचनजंघा स्वर्ण भाण्डार-सा बन गया है। 'टाइगर हिल' से मैडम का इशारा कि 'देखो यह कितना खूबसूरत है' और प्रमिला का खुशी से उछल पड़ना। सारे स्वर्ण हिम को उसने मुट्ठी में भरना चाहा था। कितना उत्साह, कितनी पुलक थी उसमें। उस समय लगता था कि वह सबकुछ कर सकती है। मगर वह कितनी गलत थी!

प्रमिला को जाड़े की मीठी धूप में चहलकदमी अच्छी लगती है। पहाड़ों का दिन कितना खुशगवार होता है गर्मियों में। शहर की भागमभाग से दूर कितनी शान्ति होती है। शाहर की प्रदूषण भरी 'ट्रैक' पर लगतातार 'बोर' होकर मजबूरी में चलते-चलते क्या यह इच्छा नहीं होती कि सबकुछ छोड़ कुछ पल सुकून से इन्हीं वादियों में गुजरें। मगर नहीं! वहाँ तो यंत्र

रखते हैं जो जड़ हैं। कोई मानवोचित भावना-संवेदना वहाँ नहीं जीती। जीवित मुर्दे, जीवन की जरुरतों को पाने, जीने, संभालने में ही दिन का हर लम्हा गुजार देते हैं। क्या प्रमिला भी वैसी ही नहीं हो गई थी? उसे याद आया-'डॉक्टर' ने सुबह नाश्ते के बाद पहली दवा लेने को कहा है, इसलिए थोड़ी देर धूपसेवन के बाद वह फिर कमरे में है। आठ-तीस बजे हैं। वह दवा की बोतल खोलती है और गहरी साँस लेती है कि फिर वही कड़वी दवा! वह पानी से किसी तरह गटक जाती है। अब वह बिस्तर पर है। यहाँ भी वही एकांत। अकेलापन कभी बोर नहीं करता उसे। पर हाँ वह ऐसे में थोड़ी और चिड़चिड़ी हो जाती है। बीते कल के जहर की वह भाण्डार है। उसकी शिराओं-धमनियों में विष बहता है। उसकी मधुरिमा खत्म हो चुकी है। एकांत में फिर वही सबकुछ उसे स्मरण हो आया और वह एक बार फिर चाहकर भी 'टेन्सन-फ्री' नहीं है, जो यहाँ उसके आने की वजहों में एक है। उसे अब भी ठीक से याद है कि वह उस समय बारह-चौदह की रही होगी जब माँ-बाप में 'डिवोर्स' हुआ। माँ सेल्फ-डिपेंडेंट थी, सो उसे रुपये की तंगी कभी न थी। मगर इस अलगाव से क्या कुछ टूट चुका था, खाली हो चुका था उसके भीतर। अब माँ कितनी बेपरवाह थी उसके प्रति। कितनी अजीब-सी हो गयी थी वह। प्रमिला को लगता कुछ गलत हो रहा है। वह शुरू से 'हॉस्टल' में थी; सो उसे कभी-कभी यह सब भूल जाता। बड़ी होने पर कलकत्ता आई। पढ़ती रही। 'हॉस्टल' अब भी उसका घर था। उसे रह-रह कर अपने पर घिन-सी होती। जब बी. ए. का रिजल्ट आया था, वह कितने अच्छे अंकों से पास हुई थी। छुट्टियाँ हुई थीं। वह लम्बे अरसे बाद घर (?) लौट रही थी। स्टेशन पर कोई 'रिसीव' करने वाला न था। वह अकेली ही अपने नए घर चली। उसे रास्ते में अपने घर का स्वरूप डरा जाता। घर पहुँची। घर, अब दो कमरों का घर नहीं बंगलॉ था। माँ अब भी वैसी ही थी। पर पता नहीं क्यों यहाँ हर चीज परायी-सी लग रही थी, माँ भी। वह स्नेह की एक बूंद भी न पी सकी। उसके सारे सपने झनझना कर टूटे हूए काँच की तरह फरेर की आवाज करते फर्श पर एकबार फिर बिखर गए। उसे लगा जैसे वह जहाँ से लायी गई है और जहाँ उसे भेजा जाना है वहाँ छुप्प अंधेरा है। प्रमिला एक हपते में ही ऊब गयी और एकबार फिर वह हॉस्टल में है। छात्रावास उसे घर से ज्यादा करीब का लगा। पढ़ाई खत्म होने पर उसके पितृवत्-गुरु की बदौलत वह जल्द नौकरी पा गई।

फिर रमेश उसकी जिंदगी में आया। वह उसके तर्कों के समक्ष कितनी छोटी हो जाती थी। रमेश उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। धीरे-धीरे वह उसपर हावी होता गया। हालांकि दोनों को विवाह में दिलचस्पी न थी, पर सामाजिक सुरक्षा के लिए विवाह अनिवार्य हो गया। प्रमिला खुश थी। मगर कुछ ही समय बाद रमेश कैसा खुलता-सा गया था उसके सामने। मुखौटा हटने के बाद उसका चेहरा कितना भयानक-विकृत लगता था। वह, जिसे जीनियस, दोस्त और न जाने कितनी अच्छाइयों की खान समझती थी, नर-पिशाच था। रोज कलह। स्थितियाँ अब आईन की तरह साफ थीं। रमेश ने एशो-आराम के लिए उससे विवाह किया था। वह उसका रक्त पीता रहा। प्रमिला बहुत समय तक चूप रही। अंत में जब वह शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के साथ-साथ, मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरने लगी तो उसे लगा कि अब स्थितियाँ सहन करने लायक नहीं हैं। वह रोज शराब पीकर देर से आता। उसे पीटता। कभी-कभी प्रमिला पागलों-सी हरकत करने लगती और क्रोध में दीवाल से सर फोड़ने लगती। धीरे-धीरे यह रोज का क्रम बन गया। वह बेहद कमजोर ही चली थी। डॉक्टर ने 'अनेमिया' बताया था। टिदायत दी थी कि ऐसा ही रहा तो मौत करीब होगी। वह ता ही जामा चाहती थी कि

प्रेम ने उसे संभाला। प्रेम उसके लिए क्या है, उसकी जिंदगी में प्रेम की क्या अहमियत है, यह वह खुद भी नहीं जानती। प्रेम एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंशेन है। प्रेम पेसा से वकील है। अच्छी आमद है क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी चलती है। उसके प्रयास से वह 'डिवोर्स' पा सकी। और अबकी छुट्टी में वह भी उसके साथ आया है। प्रेम यहाँ किसी आत्मीय के घर ठहरा है। एकाएक होटल के कर्मचारी ने उसकी तंद्रा तोड़ी—

"मैडम! चाय?"

"रख दो।"

"अच्छा।"

कर्मी जा चुका था। प्रमिला ने घड़ी देखी और चौंक उठी। सवा पाँच हो रहे थे। प्रेम के आने का वक्त हो चुका है। वह अक्सर एक दिन के अंतराल पर उससे मिल जाता है। जब से वह आई है यहाँ, वह दो बार आ चुका है। कल उसने वादा किया था कि वह अब रोज आएगा क्योंकि प्रमिला ने उससे अपनी परेशानी कही थी कि यहाँ बात करनेवाला कोई नहीं, वह दिनभर 'वीर' होती है बिस्तर पर पड़े-पड़े। बोह यहाँ डेढ़-एक घंटे रहेगा। उनमें किसी 'टॉपिक' पर तर्क-वितर्क होगा। अंत में वह अपने घर लौट जाएगा।

एकाएक प्रमिला बालकनी में चली जाती है। शाम के डूबते सूरज की लालिमा से पास के खंखड़ पेड़ की ठूंठ डालियाँ नहा-सी गई हैं। रात के वक्त जब कभी नींद खुलने पर वह बालकनी में खड़ी हो जाती है तो ठूंट पेड़ किसी भयानक आदमी-सा थू यात-सा भयावह लगता है, जिसे देख वह डर जाती है। पतन्तु अभी वह कितना खूबसूरत छलावा लग रहा है। थोड़ा-सा आगे का लंबा सघन एक पेड़ जो आस-पास के पतले पर बहुत ऊँचे युक्तिलप्टस और प्रूस, पाइन, चीड़ के पेड़ों के बीच एक अपवाद-सा लगता है, बड़ा मोहक लग रहा है। उसकी हरेक पत्ती पर सूर्य-लालिमा की क्रीड़ा देखते ही बन रही है। लगता है पूरा माहौल लालिमा में छन उठा हैरान के वक्त बिजली के बल्ब के हल्के प्रकाश में इन पेड़ो पर से टपकती ओस की बूंदें मुक्ताओं-सी प्रतीत होती हैं। बचपन में प्रमिला इन मुक्ताकणों को बड़ी सावधानी से अपनी अंजुली में एकत्र कर गालों से स्पर्श करती पुलक एवं कौनुकवश और उसकी ठण्डक पाते ही सिहर उठती, फिर इन्हें चारों ओर बिखेर कर नाचने लगती। तभी घोंसले में लौटती चिड़ियों के कलरव से वह जाग-सी उठती है, उसे कमरे में आहट-सी सुनाई पड़ती है, घूमकर देखने पर वह खुशी से चौंक-सी उठती है

"अरे! तुम!"

"देखो! एकबांर फिर मैं ही!"

"आज कुछ ज्यादा ठंड है?"

"नहीं तो।"

"नहीं तो क्या?"

"रोज जितनी ही तो है।"— प्रेम बोल उठा।

"तुमने शॉल ओढ़ी है?"— प्रेम के स्वर में कड़ापन है।

प्रमिला का ध्यान इस ओर न गया था। वह एकाएक इस प्रश्न से चौंक कर देखती है। नहीं! उसने शॉल नहीं ओढ़ रखी है।

"आते ही जासूसी, डाँट-फटकार शुरू?"

हालांकि प्रमिला को प्रेम का ऐसा करना अच्छा लगता है, मगर वह झूठी बेरुखी से प्रत्युरूत्न देती है। आज फिर उनकी बात 'नार्मल' ढंग से शुरू हुई और कुछ ही देर में 'एबनार्मल' स्तर पर पहुँच गयी।

"विवाह क्या जरूरी है?"

प्रमिला के चेहरे पर विरक्ति है। वह थोड़ी अबूझ-सी लगती है। प्रेम ने मजाक किया—

"ये वह लड्डू..."

प्रमिला ने बीच ही में बात काट दी।

"साफ-साफ बतलाओ।"

"ये एक ऐसी रस्म है जिसे न चाहकर भी इस

समाज के लोगों को पोषित करना पड़ रहा है।''

''न चाहकर?''

''हाँ! न चाहकर। मैं पीछे की नहीं कहता।''

''तो क्या आज की?''

''हाँ! क्योंकि विवाह आज सिक्योरिटी की गारंटी नहीं।''

''यह मैं सोचता हूँ। मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ।''

''मर्द हो। क्या फर्क पड़ता है।''

''ऐसी बात नहीं।''

''क्या नहीं? यह हमारे लिए है क्या?''

''यदि पैर मजबूती से गड़े हों तो?''— प्रेम का उत्तर प्रश्न है।

''तो भी कहां?''

''लोग रहना हराम कर दें।''

''तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि औरत की परिभाषा, उसका अर्थ उससे जुड़े संबंध हैं?

''एकजैक्टली।''

''तुम जहाँ रहते हो वहाँ ऐसी ही सोच जीवित है। मूलतः जो औरत, बिना संबंध के, अकेली हो, समाज के लिए एक सराय है, जिसमें हर आता-जाता बसेरा कर लेता है।''

''तो क्या पुरुष से इतर हर स्त्री की सत्ता पतिता के ही रूप में मानी जानी चाहिए?'' प्रेम ने अनजाने में यह कह तो दिया पर उसे न मालूम था प्रमिला इसे अन्यथा ले लेगी। वह बुरा मान जाएगी। प्रमिला ने कहा—

''मैं ऐसा तो नहीं कहती। तुम्हारा मतलब मुझसे है?'' प्रेम डर गया कि उसने प्रमिला को दुःखी कर दिया। वह बात 'ट्रैक' पर लाता है।

''नहीं। मेरा मतलब तुमसे कभी नहीं था।''

''देखो! मैं तो....''

प्रेम के पास शब्द नहीं हैं। वह कंगाल है। अक्सर प्रमिला का यथार्थ उसके यथार्थ को बौना कर देता है एवं उसे उन क्षणों में उसका स्वयं का अस्तित्व रेत-सा लगता है।

''देखिये! मैं एक बात कहती हूँ कि बिना औरत के मर्द स्वाधीनता से जी सकता है पर बिना मर्द के औरत....''

''जिय बिनु देह नदी बिनु बारी।
तैसहिं नाथ पुरूष बिनु नारी॥''

''तुलसीदास! क्या त्रासदी है। मजबूरी है।''

''पुरूष की उच्छृंखलता क्षम्य है पर समाज हमें यह अधिकार नहीं देता।''

प्रमिला की खामोश आँखों में बेचारगी की घायल चिड़िया चें-चें कर रही है। एक गहरी सांस लेकर वह फिर कहती है—

''यदि संबंधों में गर्माहट न हो और नारी की भी उच्छृंखलता, गलतियाँ क्षम्य हों तो विवाह मजबूरी नहीं है; प्रेम! क्योंकि औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत की कमी नहीं हुआ करती।''

प्रेम की आँखों में पराजित होने पर भी खुशी है।

आज प्रमिला फिर उससे जीत गयी तर्क में, मगर उसे कभी भी प्रमिला से जीतने पर लुत्फ नहीं आता। एकाएक वह प्रमिला की ओर देखता है, उसे लगता है उसकी (प्रमिला की) आँखों में विकल्प की तलाश है।

The Editorial Collective
A Genealogical Elaboration

History teaches how to laugh at the solemnities of origin. Don't we need to detach ourselves from this continuous monotony of names? Tradition, imprisoned in these names, can only express itself instrumentally, resulting in the transition from a positive reading of the powers and capacities of the past to a negative one. Indeed, we are victimized by our own instrumental formulation.

YEAR	EDITORS	PUBLICATION SECRETARIES
1914-15	Pramatha Nath Banerjee	Jogesh Chandra Chakravarti
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta	Prafulla Kumar Sircar
1917-18	Saroj Kumar Das	Ramaprasad Mukhopadhyay
1918-19	Amiya Kumar Sen	Mahmood Hasan
1919-20	Mahmood Hasan	Paran Chandra Gangooli
1920-21	Phiroze E. Dastoor	Shyama Prasad Mookerjee
1921-22	Shyama Prasad Mookerjee Barajakanta Guha	Bimal Kumar Bhattacharya Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Uma Prasad Mookerjee	Akshay Kumar Sarkar
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta	Bijoy Lal Lahiri
1925-26	Asit K. Mukherjee	
1926-27	Humayun Kabir	Lokesh Chandra Guha Roy
1927-28	Hirendranath Mukherjee	Sunit Kumar Indra
1928-29	Sunit Kukar Indra	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Taraknath Sen	Ajit Nath Roy
1930-31	Bhabatosh Dutta	Ajit Nath Roy
1931-32	Ajit Nath Roy	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Nikhilnath Chakravarty	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Ardhendu Bakshi	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Kalidas Lahiri	Prabhat Kumar Sircar
1936-37	Asok Mitra	Arun Kumar Chandra
1937-38	Bimal Chandra Sinha	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Pratap Chandra Sen Nirmal Chandra Sen Gupta	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	A.Q.M. Mahiuddin	Bimal Chandra Dutta
1941-42	Arun Banerjee	Golam Karim
1942-46	No Publication	
1947-48	Sudhindranath Gupta	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Subir Kumar Sen	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Dilip Kumar Kar	Sourindra Mohan Chakravarti
1950-51	Kamal Kumar Ghatak	Manas Mukutmani
1951-52	Sipra Sarkar	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Arun Kumar Das Gupta	Jyotirmay Pal Chaudhuri
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta	Pradip Das
1954-55	Sukhamoy Chakravarty	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Amiya Kumar Sen	Devendra Nath Banerjee
1956-57	Ashok Kumar Chatterjee	Subal Das Gupta
1957-58	Asoke Sanjoy Guha	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Ketaki Kushari	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Gayatri Chakravarty	Rupendra Majumdar
1960-61	Tapan Kumar Chakravarty	Ashim Chatterjee
1961-62	Gautam Chakravarty	Ajoy Kumar Banerjee

YEAR	EDITORS		PUBLICATION SECRETARIES
1962-63	Badal Mukherji Mihir Bhattacharya		Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pranab Kumar Chatterjee		Pritis Nandy
1964-65	Subhas Basu		Biswanath Maity
1965-66		No Publication	
1966-67	Sanjay Kshetry		Gautam Bhadra
1967-68		No Publication	
1968-69	Abhijit Sen		Rebanta Ghosh
1969-72		No Publication	
1972-73	Anup Kumar Sinha		Rudrangshu Mukherjee
1973-74	Rudrangshu Mukherjee		Swapan Chokravarty
1974-75	Swapan Chakravarty		Suranjan Das
1975-76	Shankar Nath Sen		Paramita Banerjee
1977-78	Sugata Bose Gautam Basu		
1978-81		No Publication	
1981-82	Debasis Banerjee Somak Ray Chaudhury		Banya Datta
1982-83		No Publication	
1983-84	Sudipta Sen Bishnupriya Ghosh		Subrata Sen
1985-86	Brinda Bose Anjan Guhathakurta		Chandreyee Niyogi
1986-87	Subha Mukherjee Apurba Saha		Jayita Ghosh
1987-88		No Publication	
1988-89	Anindya Dutta Suddhasatwa Bandyopadhyay		Sachita Bhowmick
1989-90	Abheek Barman Amitendu Palit Adrish Biswas		Debashis Das
1990-92	Jayanta Ray Shiladitya Sarkar Debraj Bhattacharya Pathikrit Sengupta	Jt. Publication	Pratik Mitra Chandrani Majumdar Sanjoy Chakraborty
1993-95	Soumya Sundar Mukhopadhyay Arjun Deb Sen Sharma Debanug Dasgupta Santanu Das	Jt. Publication	Ananda Sankar Roy Soumya Sundar Mukherjee
1995-96	Sanjoy Chakraborty Saibal Basu		Arijit Bhattacharya
1996-98	Bodhisattva Kar Anirban Mukherjee Anindyo Sengupta Kumar Kislay	Jt. Publication	Raja Bhattacharya Ashis Pathak